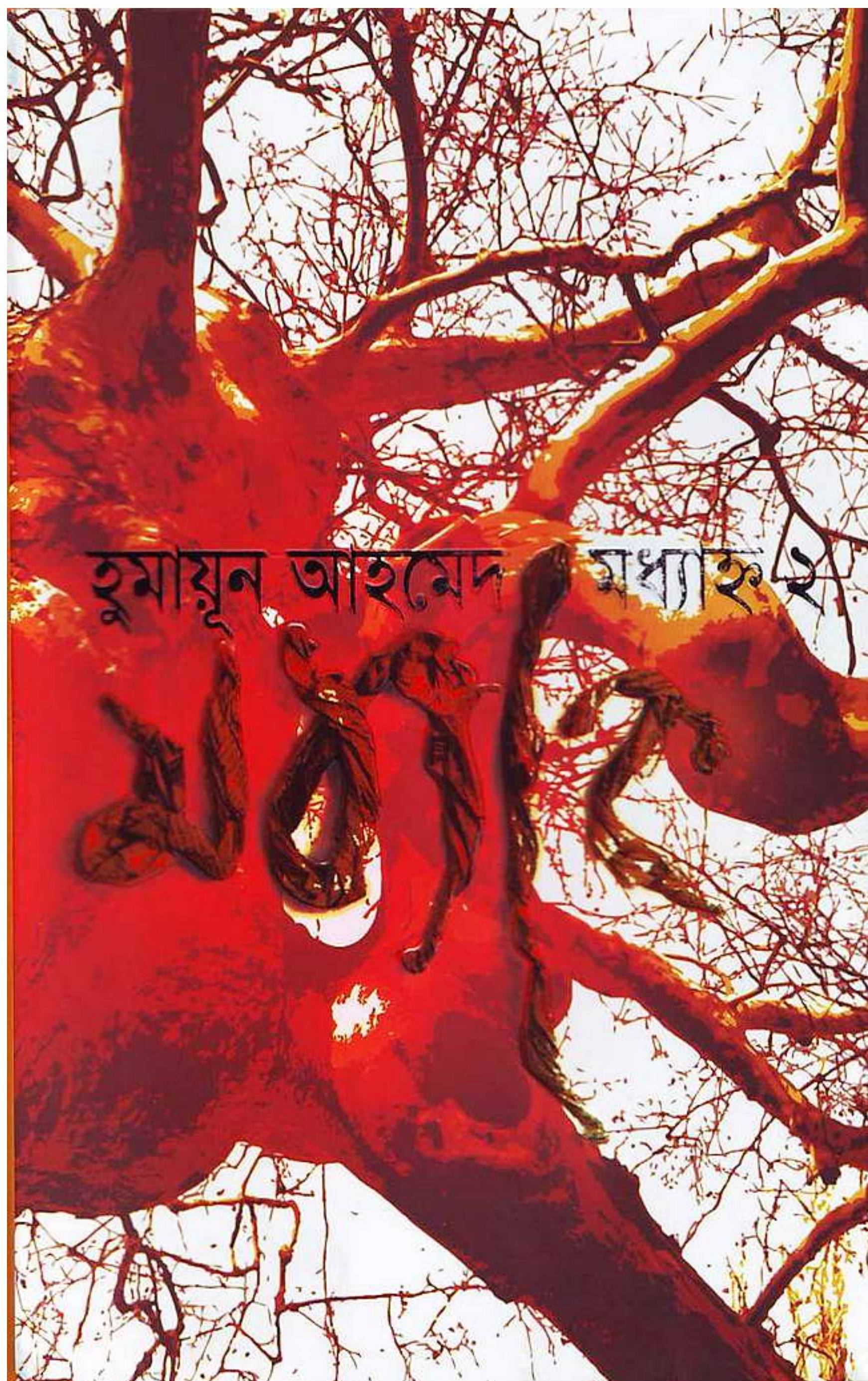


## **Maddhanya.2 by Humayun Ahmed** **[Part.1]**



**For More Books & Music Visit [www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)**  
**MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>**  
**[suman\\_ahm@yahoo.com](mailto:suman_ahm@yahoo.com)**



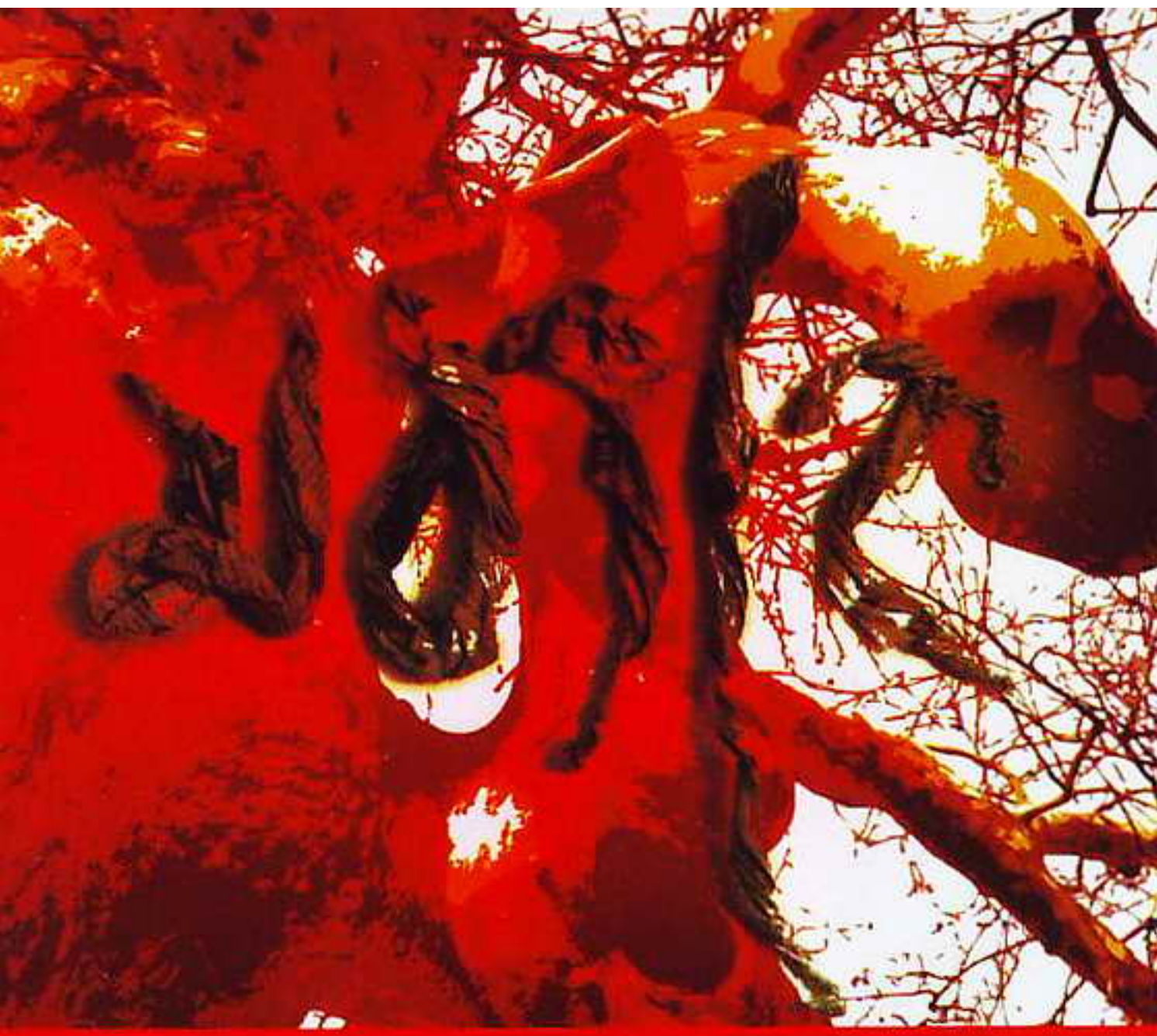


হুমায়ূন আহমেদ

মধ্যাহ্ন

কবিতা





মধ্যাহ্ন রচনায় যারা নানান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ইন্টারনেট নামক আধুনিক প্রযুক্তিকে। অনেক তথ্য সেখান থেকে পেয়েছি। তবে আমি ঐতিহাসিক না, একজন গল্পকার। আমার প্রথম ঝোক গল্প বলার দিকে। দ্বিতীয় ঝোকও গল্পে। ইতিহাস যেটুকু না আনলেই নয় ততটুকু এনেছি।

উপন্যাসের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখার অতি বিরক্তিকর কাজটি শাওন করেছে। তাকে ধন্যবাদ। পুত্র নিষাদ কয়েকবারই পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে আমাকে রাগানোর চেষ্টা করেছে। রাগ করতে পারি নি। তাকেও ধন্যবাদ লেখার সময় আশেপাশে থাকার জন্যে।

ধন্যবাদ পাঠকদের, যারা আগ্রহ নিয়ে মধ্যাহ্নের প্রথম খণ্ড পড়েছেন। তাদের আগ্রহের কারণেই দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে শুরু করেছিলাম।

হুমায়ূন আহমেদ  
দখিন হাওয়া, ধানমণ্ডি



বোবায় ধরা নামের একটি জটিল ব্যাধি আমার  
আছে। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মনে হয় বিকট দর্শন  
জন্তুর মতো কয়েকটি অতিপ্রাকৃত প্রাণী আমার  
বুকে বসেছে। গলা চেপে মেরে ফেলার চেষ্টা  
করছে। আতংকে অস্থির হয়ে আমি চিৎকার  
করতে থাকি। তখন একটা কোমল স্পর্শ আমার  
কপালে পৌঁছে। গভীর মমতায় একজন বলে,  
'এই তো আমি আছি।' আমার ঘুম ভাঙে, আমি  
স্বাভাবিক হই।

মমতাময়ী শাওনকে।



## প্রকাশকের কথা

‘দিন যায়, ক্ষণ যায়,/সময় কাহারো নয়,/বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির’—সময় সম্পর্কে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই বলেছেন কবিতায়। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, সময়ের একটি চিহ্ন রয়েছে; রূপ রয়েছে। এক-একটি যুগে, শতাব্দীতে সময়ের নানা চেহারা আমরা দেখতে পাই। যে শতাব্দীটি আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, সেই সময়ের সঙ্গে এই সময়ের কি ফারাক নেই? অবশ্যই রয়েছে। মানুষের যাপিত জীবন, চারপাশের প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিন্নতার মধ্যেই সময়ের ফারাকটি টের পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছিল ইংরেজ শাসিত অখণ্ড ভারতবর্ষ, হিন্দু-মুসলমানের তীব্র দ্বন্দ্ব, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের লড়াই। আবার এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন, দেশভাগ—কত কিছুই না সংঘটিত হয়েছে! সেই সময়কে উপজীব্য করে এই সময়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তবে একটি কথা, বিশাল ক্যানভাসের এই উপন্যাসে সময়ের ছাপ পাওয়া গেলেও, ইতিহাসের রেখাপাত ঘটলেও, উপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য ছিল—গল্প বলা; সেই সময়ের মানুষের কথা বলা।

‘মধ্যাহ্ন’-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর অসংখ্য পাঠকের কাছ থেকে আমরা চিঠি ও ইমেইল পেয়েছি। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ও টেলিফোনে তাদের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ড কবে প্রকাশিত হবে সে-বিষয়ে সবার গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। ‘মধ্যাহ্ন’-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

মাজহারুল ইসলাম





কলিকাতা সমাচার পত্রিকায় মৎস্যকন্যা বিষয়ে একটা খবর ছাপা হয়েছে। প্রথম পাতায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা সংবাদ। পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি অরুণাভ বিশ্বাস জানাচ্ছেন—

## জীবিত মৎস্যকন্যা ধৃত (অরুণাভ বিশ্বাস প্রেরিত)

কালীগঞ্জে গঙ্গার মোহনায় একটি মৎস্যকন্যা জীবিত অবস্থায় ধীবরদের জালে ধৃত হয়। মৎস্যকন্যাকে এক নজর দেখিবার জন্যে শত শত লোক কালীগঞ্জে জমায়েত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে জানা যায়, মৎস্যকন্যার চুল সোনালি, চক্ষের রঙও সোনালি। গাত্রবর্ণ নীলাভ। ধৃত হইবার পর হইতেই সে ক্রমাগত তাহার বাম হস্ত নাড়িতেছিল এবং দুর্বোধ্য ভাষায় বিলাপের মতো ধ্বনি করিতেছিল। তাহার চোখ হইতে ঈষৎ বাদামি বর্ণের অশ্রু নির্গত হইতেছিল। ধৃত হইবার দুই ঘণ্টার মধ্যে অঞ্চলের কিছু বিশিষ্টজনের প্ররোচনায় তাহাকে হত্যা করা হয়। অসমর্থিত এক সংবাদে জানা যায় যে, মৎস্যকন্যার মাংস আহার করিলে চিরযৌবন লাভ হয় এই বিশ্বাসে মৎস্যকন্যাকে কাটিয়া তাহার মাংস অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। এই বিষয়ে পুলিশি মামলা হইয়াছে। পুলিশের উচ্চপর্যায়ে বিষয়টি নিয়া পর্যালোচনা করা হইয়াছে এবং তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই বর্বর কর্ম করিয়াছেন, তাহারা বর্তমানে পলাতক।

কলিকাতা সমাচার বাকুবপুরে আসে না। সুলতান মিয়া নামে একলোক পত্রিকা নিয়ে উপস্থিত হলো। শুধু পত্রিকা না, সে মৎস্যকন্যার দুই পিস মাংসও



না-কি এনেছে, এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ল। সুলতান মিয়া নতুন লঞ্চ কোম্পানি লক্ষ্মী নেভিগেশনে বাবুর্চির কাজ করে। সোহাগগঞ্জ বাজারের হোটেলে মাঝেমধ্যে রাত কাটায়। তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ধূর্ত চোখ। হাত-পা সরু। হাঁটে কঁজো হয়ে। তার খুতনিতে এক গোছা দাড়ির কারণে তাকে দেখায় আলাদিনের চল্লিশ চোরের এক চোরের মতো। লঞ্চ-স্টিমারের বাবুর্চিরা বিনয়ী হয়, সে উদ্ধত প্রকৃতির।

সুলতান মিয়া মৎস্যকন্যার মাংস নিয়ে এসেছে শুনে শশাংক পাল তাকে ডেকে পাঠালেন। একজীবনে তিনি নানান ধরনের মাংস খেয়েছেন। মৎস্যকন্যার মাংস খাওয়া হয় নি।

শশাংক পালের এখন শেষ সময়। সারা শরীর ফুলে উঠেছে। শরীরে সার্বক্ষণিক ব্যথা। সেই ব্যথা ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে। কালো পিঁপড়ায় কামড়ালে ব্যথা খানিকটা কমে। শশাংক পালের নিজের লোক সুলেমানের প্রধান কাজ হচ্ছে, কালো পিঁপড়া ধরে এনে শশাংক পালের গায়ে ছেড়ে দেয়া। পিঁপড়া ছাড়ার পর পর শশাংক পাল কাতর গলায় বলেন, কামড় দে বাবারা। কামড় দে। তোদের পায়ে ধরি। জমিদার শশাংক পাল তোদের পায়ে ধরছে। ঘটনা সহজ না। ঠিকমতো কামড় দে, পিরিচে মধু ঢেলে তোদের খেতে দিব। আরাম করে মধু খাবি।

পিঁপড়াদের খাবারের জন্যে পিরিচে সত্যি সত্যি মধু ঢেলে রাখা হয়। বিচিত্র কারণে পিঁপড়ারা মধু খাওয়ার কোনো আগ্রহ দেখায় না। শশাংক পাল নিজের গায়ে মধু মেখে দেখেছেন। পিঁপড়ারা তাঁর সারা শরীরে হাঁটে, মধু মাখা অংশের ধারেকাছে যায় না।

কালো পিঁপড়া কামড়ালে ব্যথা কমে, এই তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন গাছ-চিকিৎসা করতে গিয়ে। গাছ-চিকিৎসায় পুরুষ্ট কোনো একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে থাকতে হয় এবং মনে মনে বলতে হয়— ‘হে বৃক্ষ! তুমি আমার রোগ তোমার শরীরে ধারণ করে আমাকে রোগমুক্ত কর।’ রোগমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত গাছ জড়িয়ে থাকার নিয়ম। প্রবল বৃষ্টি এবং গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ার কারণে আট ঘণ্টার মধ্যেই শশাংক পাল বিশেষ এই চিকিৎসার ইতি ঘোষণা করেন। লাভের মধ্যে কালো পিঁপড়ায় কামড়ালে ব্যথা কমে এই তথ্য আবিষ্কার করেন।

সুলতান মিয়া খবর পেয়ে শশাংক পালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে সরাসরি তাকাতে পারছে না, কারণ শশাংক পাল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পাটিতে শুয়ে আছেন। শীতলপাটির উপর কলাপাতা বিছানো। একজন নিমগাছের ডাল



দিয়ে তাকে বাতাস দিচ্ছে। নিমপাতার হাওয়া শরীরের জন্যে উপকারী। শশাংক পাল কিছুক্ষণ আগে বমি করেছেন। মুখ ধোয়া হয় নি। বেশ কিছু পুরুষ্ট নীল রঙের মাছি মুখের চারপাশে উড়াউড়ি করছে। নিমপাতার হাওয়ার কারণে মুখে বসতে পারছে না। তারা হতোদ্যম হয়ে চলেও যাচ্ছে না। রবার্ট ক্রুসের ধৈর্য নিয়ে চেষ্টা করেই যাচ্ছে।

শশাংক পাল বললেন, শরীরে কাপড় রাখতে পারি না। শরীর জ্বালা করে। এই জন্যে ন্যাংটা হয়ে আছি। বুঝেছ ?

সুলতান মিয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শশাংক পাল বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বিদেশী মানুষ। তুমি কি আমাকে চেনো ?

সুলতান মিয়া আবারো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমার সম্বন্ধে কী জানো অল্পকথায় বলো। সারমর্ম বলবা, ইতিহাস শুরু করবা না। ইতিহাস শোনার সময় আমার নাই। জীবনের শেষপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি। এখন ঝটপট বলো, আমি কে ?

আপনি জমিদার শশাংক পাল।

একসময় জমিদার ছিলাম। আমার রক্ষিতা ছিল চারজন। এখন আমি ফালতু। শশাংক পাল, বালস্য বাল। হা হা হা।

শশাংক পাল হেঁচকি না ওঠা পর্যন্ত হাসলেন। অতি কষ্টে বললেন, লোকমুখে শুনেছি তুমি না-কি মৎস্যকন্যার মাংস নিয়ে এসেছ ?

সুলতান মিয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশাংক পাল বললেন, মাথা নাড়ানাড়ি বন্ধ। হ্যাঁ বলবা কিংবা না বলবা। মৎস্যকন্যার মাংস এনেছ ?

হ্যাঁ।

কতখানি এনেছ ?

দুই পিস। এক পিস বিক্রি করে দিয়েছি। আরেক পিস আছে।

মৎস্যকন্যার মাংস খেলে চিরযৌবন লাভ হয়, এটা কি সত্য ?

জানি না। লোকে বলে।

তুমি নিজে খেয়েছ ?

না।

এক পিস মাংস যে বিক্রি করেছ, কার কাছে বিক্রি করেছ ? তার নাম ঠিকানা বলো।



গোয়ালন্দে এক লোকের কাছে বিক্রি করেছি। কাপড়ের ব্যবসা করে। নাম জানি না।

কত টাকায় বিক্রি করেছ ?

কত টাকায় বিক্রি করেছি সেটা আপনারে বলব না।

কেন বলবা না ?

সুলতান মিয়া চুপ করে রইল। শশাংক পাল বললেন, আমার আগের দিন থাকলে বেয়াদবির জন্যে তোমাকে ন্যাংটা করে মাটিতে পুঁতে ফেলতাম। যাই হোক, এখন বলো মাংস কোথায় পেয়েছ ?

কালিগঞ্জ থেকে এনেছি। যেখানে মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছে সেখান থেকে এনেছি।

তার অর্থ কি এই যে, তুমি নিজ চোখে মৎস্যকন্যা দেখেছ ?

হঁ।

শশাংক পাল ধমক দিয়ে বললেন, হঁ আবার কী ? আদবের সঙ্গে বলো— দেখেছ কি দেখ নাই।

দেখেছি।

আমরা ছবিতে যেরকম দেখি সেরকম ?

সুলতান মিয়া অস্পষ্ট গলায় বলল, সেরকমই, তবে মুখ ছোট।

গাত্রবর্ণ কী ?

নীল।

তার বুকের সাইজ কী ? বাঙালি মেয়েদের মতো, না-কি বুকও মুখের মতো ছোট ?

খিয়াল নাই।

খিয়াল নাই মানে ? বুক দেখো নাই ? লজ্জা পেয়েছিলো ? মৎস্যকন্যা উদাম গায়ে পানিতে ঘুরে। সে তো শাড়ি দিয়া শরীর ঢাকে না। তারে নগ্ন দেখাই স্বাভাবিক।

সুলতান মিয়া বলল, আমি যখন দেখেছি তখন উড়না দিয়া তার বুক ঢাকা ছিল।

উড়না দিয়া বুক ঢাকার প্রয়োজন পড়ল কেন ?

সুলতান মিয়া বলল, অনেক ছোট ছোট পুলাপান ছিল, এইজন্যে ঢাকা হয়েছিল। মাতব্বররা ঢাকতে বললেন।



শশাংক পাল বললেন, তুমি বিরাট মিথ্যুক, এইটা তুমি জানো ? তুমি কিছুই দেখে নাই। সব বানায়ে বলতেছ। তুমি আছ টাকা কামানোর ধান্দায়। দুই পিস মাংস কোনখান থেকে যোগাড় করে সেটা বিক্রির ধান্দায় আছ। যে মাংস তুমি এনেছ আমার মন বলতেছে সেটা কুকুরের মাংস। তুমি এক ধান্দাবাজ, আমি তোমার চেয়ে বড় ধান্দাবাজ।

সুলতান মিয়া বলল, আপনার সঙ্গে কথা পাল্টাপাল্টি করব না। অনুমতি দেন আমি যাই।

শশাংক পাল বললেন, অনুমতি দিলাম না। তুমি যে ধান্দাবাজ এটা স্বীকার করে তারপর বিদায় হও।

সুলতান মিয়া স্বাভাবিক গলায় হাই তুলতে তুলতে বলল, আচ্ছা স্বীকার করলাম। এখন বিদায় দেন। আপনার সঙ্গে আমি বাহাস করব না। আপনি যেটা বলেন সেটাই সত্য।

আমার সঙ্গে বাহাস করবা না কেন ?

আমি কারোর সাথেই বাহাস করি না। আমার কাছে এক টুকরা মাংস আছে। দশ হাজার টাকা দাম। আপনি ইচ্ছা করলে খরিদ করতে পারেন।

শশাংক পাল বিস্মিত গলায় বললেন, দশ হাজার টাকা দাম ? তুই কস কী ? দশ হাজার টাকায় একজোড়া জীবন্ত মৎস্যকন্যা পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে যৌনকর্ম করা যায়।

সুলতান নির্বিকার গলায় বলল, পাওয়া গেলে খরিদ করেন। যৌনকর্ম করতে চাইলে করেন। আপনার বড় পুসকুনি আছে। পুসকুনিতে ছাড়েন। আমারে তুই তুকারি করবেন না, আমি আপনার কর্মচারী না।

শশাংক পাল নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। এই বদের বাস্তব সঙ্গে কথা চালাচালির অর্থ হয় না। মূল প্রসঙ্গে যাওয়াই ভালো। তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, মাংস খাইতে হয় কীভাবে ? রান্না কইরা খাইতে হয়, না-কি কাঁচা খাইতে হয় ?

জানি না।

এক হাজার টাকা নগদ দিতে পারি। যদি পোষায় দিয়া যা। টাকা নিয়া যা।

সুলতান স্পষ্ট গলায় বলল, না। বলেই বের হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়াল না।

শশাংক পাল ধাঁধায় পড়ে গেলেন। সত্যি কি এর কাছে আসল বস্তু আছে ? চিরযৌবন সহজ ব্যাপার না। এর জন্যে রাজত্ব দিয়ে দেয়া যায়। রাজত্বের কাছে



দশ হাজার টাকা কোনো টাকাই না। তাছাড়া টাকা দিয়ে তিনি করবেনইবা কী? মৃত্যু মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি মাথা ঘুরাতে পারেন না বলে দেখতে পারেন না। এক পিস মৎস্যকন্যার মাংস খেলে চিরযৌবন না পাওয়া গেলেও রোগটা তো সারতে পারে।

বিষয়টা নিয়ে তিনি কি কারো সঙ্গে আলাপ করবেন? আলাপ-আলোচনা করার লোকও নাই। সব ধান্দাবাজ। সবাই আছে নিজের ধান্দায়। কাউকে বিশ্বাসও করা যায় না। মাওলানা ইদরিসকে খবর দিয়ে আনা যায়। সেও গাধা। গাধা মাওলানা। হাদিস-কোরানের বাইরে কিছুই জানে না। শশাংক পাল বিরক্ত গলায় ডাকলেন, সুলেমান! সুলেমান!

সুলেমান ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করে। দূর-দূরান্তে চলে যায়। সে এইসব বিষয় জানতে পারে। সুলেমানকে পাওয়া গেল না। জানা গেল কিছুক্ষণ আগে সে ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তির প্রধান সমস্যা হচ্ছে, দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিক্ষা না করলে পেটের ভাত হজম হয় না।

শশাংক পালের মুখে মাছি বসেছে। নিমপাতা দিয়ে হাওয়া করে মাছি তাড়াবার কেউ নেই। তিনি নিজে হাত দিয়ে তাড়াতে পারেন। তাতে লাভ কী? আবার এসে বসবে।

পুকুরঘাটে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। শুকনা পাতার ওপর হাঁটার শব্দ কানে আসছে। শরীর পুরোপুরি নষ্ট হওয়ায় একটা লাভ হয়েছে, কান পরিষ্কার হয়েছে। অনেক দূরের শব্দও শুনতে পান।

শশাংক পাল বললেন, হাঁটে কে? কাছে আস।

কেউ একজন এসে মাথার পেছনে দাঁড়াল। এমনভাবে সে দাঁড়িয়েছে যে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

শশাংক পাল বললেন, গাধার মতো মাথার পিছনে দাঁড়ায়েছ কেন? সামনে আস তোমারে দেখি।

সারা গায়ে চাদর জড়ানো একজন শশাংক পালের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

তুমি কে?

আমার নাম লাবুস।

সুলেমানের পুলা না?

জি।



শরীরে চাদর কেন ? দরবেশ হয়েছ ? এইখানে কী চাও ?

বাপজানের খোঁজে আসছি ।

সে গেছে ভিক্ষায় । তুমি একটা কাজ কর, আরেকটা ঘোড়া জোগাড় কর ।  
বাপ-বেটায় একসঙ্গে ঘোড়ায় চইড়া ভিক্ষা করবা । মনোহর দৃশ্য । হা হা হা ।

লাবুস তাকিয়ে আছে । তাকে দেখে মনে হচ্ছে না একটি নগ্ন মানুষের দিকে  
তাকিয়ে থাকতে সে কোনোরকম লজ্জা পাচ্ছে । শশাংক পাল বললেন, নিমের  
ডাল হাতে নাও । আমারে বাতাস কর । ঘণ্টা হিসাবে পয়সা পাইবা । ঘণ্টায় দুই  
পয়সা । রাজি আছ ?

লাবুস জবাব না দিয়ে নিমের ডাল দিয়ে বাতাস শুরু করল । ঘণ্টায় দুই  
পয়সা তার জন্যে যথেষ্ট । আজ সকাল থেকে সে কিছু খায় নি । সে বাবার কাছে  
এসেছিল দুপুরের খাবারের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি-না সেই খোঁজে ।

নিমের ডালের হাওয়ায় আরাম লাগছে । মাছিগুলি যে তাড়া খাচ্ছে এই দৃশ্য  
দেখেও ভালো লাগছে । শশাংক পাল বললেন, মৎস্যকন্যার মাংস নিয়ে একজন  
যে বান্ধবপুর বাজারে এসেছে এই খবর জানো ?

লাবুস বলল, না ।

হারামজাদা এক পিস মাংসের দাম চায় দশ হাজার টাকা । থাপড়ায়ে এর  
দাঁত ফেলা দরকার । তাকে থাপড়াতে পারবা ?

লাবুস জবাব দিল না । একমনে বাতাস করতে লাগল । শশাংক পাল  
বললেন, বাজারে তারে খুঁইজ্যা বাহির কর । তারপর তার দুই গালে দুই চড়  
দেও । প্রতি চড় এক টেকা হিসেবে দুই টেকা পাইবা । রাজি ?

লাবুস জবাব দিল না ।

শশাংক পাল বললেন, কত বড় ধান্দাবাজ, কুকুরের মাংস নিয়ে এসে বলে  
মৎস্যকন্যার মাংস! আমার কাছে বেচতে চায় । ভাবছে কী ? এই মাংস খাওয়ার  
চেয়ে গু খাওয়া ভালো । ঠিক না ?

লাবুস বলল, ঠিক ।

শশাংক পাল পরদিন দুপুর দুটোর সময় মৎস্যকন্যার মাংস খেলেন । কাঁচাই  
খেলেন । রান্না করলে যদি গুনাগুণ নষ্ট হয়ে যায় ! মাংস খাবার সময় সুলতান  
সামনে বসে রইল । লবণভর্তি মাংস— খাওয়ার সময় শরীর উল্টে যাবার মতো  
হলো । শশাংক পাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, নুনা ইলিশের মতো স্বাদ । এর  
কারণ কী ?



সুলতান বলল, মাংস যাতে নষ্ট হয়ে না যায় এর জন্যে নুন দিয়ে জারানো। চাবায়ে খাওয়ার দরকার কী! ওষুধের ট্যাবলেটের মতো গিলে ফেলেন। এটা তো ওষুধই।

অনেক কষ্টে শশাংক পাল মাংস গিললেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরে জ্বলুনি শুরু হলো। যেন কেউ নাগা মরিচ বেটে শরীরে মাখিয়ে দিয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর জ্বলুনি যে শশাংক পালের ইচ্ছা করছে নিজেই টান দিয়ে তার গায়ের চামড়া খুলে ফেলেন। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমাকে ধরাধরি করে পুসকুনির পানিতে ডুবিয়ে রাখ। আমার সর্বাস্ত জ্বলে যাচ্ছে গো। সর্বাস্ত কেউ যেন আগুন দিয়ে পুড়াচ্ছে। হায় ভগবান, এ-কী শাস্তি!

তাকে পুকুরের পানিতে ডুবানো হলো। দুইজন দুই দিক থেকে হাত ধরে আছে। তিনি মাথা ভাসিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে মুখে পানির ছিটা দেয়া হচ্ছে। বান্ধবপুরের মানুষ পুকুরের চারদিকে জড়ো হলো। তাদের কৌতূহলের সীমা নাই। শশাংক পাল বললেন, দেখ মিনি মাগনার মজা। মৎস্যকন্যার মাংস খেয়ে আমি হয়েছি মৎস্যপুরুষ। পানিতে বাস করা শুরু করেছি। এমন মজা দেখবো না। কোনো সার্কাস পার্টিতেও এই মজা নাই।

সন্ধ্যাবেলা তিনি মাওলানা ইদরিসকে খবর দিলেন। ক্ষীণ গলায় বললেন, সবাই মজা দেখতে এসেছে, আপনি নাই, এটা কেমন কথা? মজা ভালো লাগে না?

মাওলানা বললেন, আপনি বিরাট যন্ত্রণার মধ্যে আছেন। মানুষের যন্ত্রণা দেখতে ইচ্ছা করে না।

এটা কী বললেন মাওলানা? যন্ত্রণা দেখার মধ্যেই আনন্দ। অন্যের যন্ত্রণা হচ্ছে, আমার হচ্ছে না— আনন্দ না?

মাওলানা জবাব দিলেন না। শশাংক পাল বললেন, আপনাকে ডেকেছি একটা অতি জরুরি এবং অতি গোপন কথা বলার জন্যে। খোশগল্প করার জন্যে ডাকি নাই।

মাওলানা বললেন, বলেন কথা। আমি আছি।

শশাংক পাল ক্ষীণ গলায় বললেন, কথাটা শুধু আপনারে বলব। দুইজন আমার হাত ধরে আছে। এখন বললে তারাও শুনবে। আমি চাই না তারা শুনুক। এই তোরা দুইজন আমাকে শুকনায় তোল। কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় হ। মাওলানার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর আবার পানিতে নামাবি।

শশাংক পাল তার অতি জরুরি গোপন কথা মাওলানাকে বলে শেষ করলেন। তাকে আবারো পানিতে নামানো হলো। মধ্যরাত থেকে তিনি বিকারগ্রস্তের প্রলাপ শুরু করলেন। অতি উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন—



তোমরা যারা আমার আশেপাশে আছ তারা শোন। মন দিয়ে শোন। স্বর্গ নরক সবই আছে। আমি অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিলাম। এখন আস্তিক। আমি ডান চোখে স্বর্গ দেখছি। একই সঙ্গে বাম চোখে নরক দেখছি। স্বর্গ সম্পর্কে এতদিন যা শুনেছি সবই ভুল। স্বর্গ তোমাদের সবার কল্পনার চেয়েও মনোহর। স্বর্গে যারা বাস করেন, তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভাসতে ভাসতে যান। নরকের কথা কিছু বলব না। নরক তোমাদের সবার কল্পনার চেয়েও ভয়ঙ্কর। ভগবান, আমাকে ক্ষমা কর। ভয়ঙ্কর নরকের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

বিকারগ্রস্তের মতো চিৎকার করতে করতেই শশাংক পালের মৃত্যু হলো।

বড়গাঙের পাশে নিমাই শ্মশান ঘাটে তার চিতার আয়োজন হলো। মুখাগ্নি করার কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুরোহিত বললেন, নিকট আত্মীয়ের অভাবে তাকে পিতৃসম জ্ঞান করতেন এমন কেউ মুখাগ্নি করতে পারেন।

মড়া পোড়ানো দেখতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। পুরোহিতের কথাতে তাদের মধ্য থেকে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না।

পুরোহিত বললেন, স্বধর্মের স্ববর্ণের যে-কেউ হলেই হবে। প্রয়োজনে নিম্নবর্ণের যে-কেউ আসতে পারেন। শাস্ত্রে এই বিধান রাখা হয়েছে।

কেউ এগিয়ে আসছে না। এদিকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। চৈত্র বৈশাখে ঝড়-বৃষ্টি হয়। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, আজ বড় ধরনের ঝড় আসবে। বাতাস থমথমে।

পুরোহিত বললেন, কেউ কি আসবেন?

ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন বলল, অন্য ধর্মের কেউ কি এই কাজটা করতে পারেন?

আপনি কে?

আমি হাফেজ ইদরিস।

হ্যাঁ পারবেন।

সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শশাংক পালকে উপুড় করে শোয়ানো হয়েছে। তার মাথা উত্তরমুখী।

মাওলানা ইদরিস আগুন হাতে নিয়ে পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করছেন—

‘ওঁ দেবশচাগ্নিমুখা এনং দহন্তু!’

মন্ত্র পাঠের শেষে চিতা প্রদক্ষিণ শুরু হলো। পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, মাওলানা ইদরিস বিড়বিড় করে সেই মন্ত্র বলছেন—



‘ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা ।  
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চতুম্যাগতম ।  
ধর্মাদর্শসিমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম ।  
দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান লোকান ম গচ্ছতি ।’

‘তিনি জ্ঞানত বা অজ্ঞানতাবশত অনেক দুষ্কৃত কাজ  
করেছেন। মানুষের মৃত্যু প্রাপ্য, প্রকৃতির এই বিধানে তিনি  
মৃত্যুবরণ করেছেন। এই ব্যক্তির ধর্ম অধর্ম লোভ-মোহ  
সমাবৃত হয়েই মৃত্যু হয়েছে। এখন হে অগ্নিদেব, আপনি  
তাকে দহন করে দেবলোকে নিয়ে যান।’

মুখে আগুন দেয়ামাত্রই বড় শুরু হলো। বাতাস পেয়ে আগুন তেজি হলো।  
নামল বৃষ্টি, সেই বৃষ্টিতেও আগুন নিভল না। লোকজন সবাই বিদায় নিয়েছে।  
পুরোহিত এবং মাওলানা ইদরিস বসে আছেন। আধা টিন কেরোসিন বেচে  
গেছে। এই কেরোসিন পুরোহিতের প্রাপ্য। মাওলানার সামনে এই টিন নিয়ে  
যেতে তাঁর লজ্জা লাগছে। বিধর্মী মানুষ। নিশ্চয়ই জানে না বেঁচে যাওয়া  
সবকিছুই পুরোহিতের প্রাপ্য। সে হয়তো ভেবে বসবে লোভী পুরোহিত।

এককালের অতি প্রতাপশালী জমিদার শশাংক পালের মৃত্যু হলো ১২ই চৈত্র  
১৩৪৭ সনে।

ইংরেজি ২৩ মার্চ ১৯৪০ সন। বিশেষ একটা দিন। ওই দিন শেরে বাংলা  
এ কে ফজলুল হক ‘লাহোর প্রস্তাব’ ঘোষণা করেন। লাহোর প্রস্তাবে উত্তর-  
পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় দু’টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের  
প্রস্তাব ওঠে। লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহম্মদ আলী জিন্নাহ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। জার্মান আর্মি গ্রুপ সি বেলজিয়ামের  
ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে নেদারল্যান্ড আক্রমণ করেছে। অতি অল্প সময়ে তারা  
ফ্রান্সের গভীরে ঢুকে যায়। দুর্ভেদ্য মাজিনো লাইন কোনো কাজেই আসে না।

লন্ডনে চলতে থাকে টানা বিমান আক্রমণ। ব্রিটিশ সিংহ থমকে দাঁড়ায়।  
কারণ বোমা পড়ছে বাকিংহাম প্রাসাদে। যেখানে বাস করেন রানি এলিজাবেথ।  
রানিকে প্রাসাদ থেকে গোপন আবাসে সরিয়ে নেয়া হলো। কেউ জানে না  
কোথায় রানি। হঠাৎ হঠাৎ গোপন আবাস থেকে বের হন। ইংরেজের প্রিয় খেলা  
শিয়াল শিকারে বের হন। ঘোড়ায় চড়ে শিয়াল তাড়া করেন। আনন্দময় এই  
খেলাতেও তাঁর মনে বসে না। বড় অস্থির সময় কাটে।



ভারতবাসীরা যুদ্ধে কোন পক্ষ সমর্থন করবে ঠিক বুঝতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষে ভাগ হয়েছে। এক পক্ষ ব্রিটিশ রাজকে সমর্থন করলে অন্য পক্ষ তা করতে পারে না। কোলকাতার মুসলমানদের কেউ কেউ অদ্ভুত শ্লোগানও দিতে শুরু করেছে—

কানমে বিড়ি  
মু মে পান  
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

এই লড়াই কার বিরুদ্ধে? ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে, না-কি হিন্দুদের বিরুদ্ধে?

রাতে মাওলানা খেতে বসেছেন। তাঁর স্ত্রী জুলেখা সন্তানসম্ভবা। পিঁড়িতে বসতে কষ্ট হয় বলে স্বামীর খাবার সময় সে পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। খাবার সময় গল্পগুজব মাওলানা পছন্দ করেন না। খাওয়া হচ্ছে ইবাদত। ইবাদতের সময় গল্পগুজব চলে না। তারপরেও মাঝেমধ্যে মনের ভুলে জুলেখা দু'একটা প্রশ্ন করে ফেলে। আজ যেমন করল। কৌতূহলী গলায় বলল, জমিদার শশাংক বাবু আপনাকে যে গোপন কথাটা বলেছে সেটা কী?

ইদরিস বললেন, গোপন কথা তোমাকে কেন বলব?

জুলেখা বলল, আমি আপনার স্ত্রী এইজন্যে বলবেন।

ইদরিস বললেন, তুমি আমার স্বভাব জানো। এই কাজ আমি কখনো করব না।

জুলেখা বলল, গোপন কথা কি জমিজমার বিলি ব্যবস্থা নিয়ে?

মাওলানা বললেন, না। এই বিষয়ে তুমি আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করবা না।

অন্য কোনো বিষয়ে কি কিছু বলব?

বলো।

আপনি নামাজ কালাম ছেড়ে দিয়েছেন কেন? লোকমুখে শুনলাম শশাংক পালের মুখাগ্নি করেছেন। আপনি তাঁর কে?

মাওলানা জবাব দিলেন না। তার কপালে কুণ্ডল রেখা দেখা দিল।

জুলেখা নিচু গলায় বলল, আমি আপনার সঙ্গে বাস করতে আসার পরই আপনি নামাজ কালাম ছেড়েছেন। নিজেকে আমার দোষী মনে হয়।

ইদরিস বললেন, কে দোষী কে নির্দোষী সেই বিচার আল্লাহপাক করবেন। এইসব নিয়া চিন্তা করবা না।

লোকে বলে আপনার মাথা না-কি পুরাপুরি খারাপ হয়েছে। এটা কি সত্যি ?  
ইদরিস বললেন, আমি বাস করি তোমার সাথে। আমার মাথা খারাপ হলে  
সবের আগে তুমি বুঝবা।

জুলেখা বলল, রাতে আপনি ঘুমান না। উঠানে মোড়ার উপর বসে থাকেন।  
চিন্তা করি। এইজন্যে ঘুমাই না। মানুষ ঘুমের মধ্যে চিন্তা করতে পারে না।  
চিন্তা করতে হয় জাগ্রত অবস্থায়।

কী নিয়া চিন্তা করেন ?

সেটা তোমারে বলব না।

কেন বলবেন না ? কেউ তো আপনারে বলে নাই— চিন্তার বিষয় নিয়া তুমি  
তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবা না। কেউ তো আপনারে নিষেধ করে নাই।

ইদরিস চাপা গলায় বললেন, নিষেধ করেছে।

জুলেখা আগ্রহ নিয়ে বলল, কে নিষেধ করেছে ?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাওলানা খাওয়া শেষ করে হাত ধোয়ার জন্যে  
বারান্দায় চলে গেলেন। বারান্দায় কলসিভর্তি পানি এবং লোটা রাখা আছে।  
মাওলানা বারান্দায় এসেই ডান পায়ে মেঝেতে কয়েকবার বাড়ি দিলেন। মাস  
চারেক হলো বাড়িতে একটা সাপ দেখা যাচ্ছে। বিশাল শঙ্খচূড়। বাস্তুসাপের  
বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না। বাস্তুসাপ গৃহস্থের জন্যে মঙ্গল এবং কল্যাণ  
নিয়ে আসে। তাছাড়া জুলেখার সন্তান হবে। এই সময়ে কোনো জীবজন্তুকে কষ্ট  
দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। জুলেখা পিতলের একটা বাটিতে প্রতিদিন সাপের জন্যে  
দুধ রেখে দিচ্ছে। সাপকে কখনো দুধ খেতে দেখা যায় নি। তবে বাটির দুধ  
থাকছে না। কেউ একজন খেয়ে নিচ্ছে। সাপের কারণে খরচ বেড়েছে।  
সারারাত খাটের নিচে হারিকেন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। যুদ্ধের কারণে  
কেরোসিনের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। বাজারে বলাবলি হচ্ছে কয়েকদিন পর এক  
ফোঁটা কেরোসিনও পাওয়া যাবে না। সব কেরোসিন চলে যাচ্ছে ফৌজিদের  
কাছে। তারা সারাগায়ে কেরোসিন মেখে বনেজঙ্গলে যুদ্ধ করে। কেরোসিন  
মাথার কারণে সাপখোপ পোকামাকড় তাদের কাছে আসে না।

মাওলানা উঠানে তার নির্দিষ্ট জায়গায় মোড়ার ওপর পা তুলে বসেছেন।  
চিন্তা এখনো শুরু করেন নি। জুলেখা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পান নিয়ে তাঁর  
কাছে আসবে। তিনি পান চিবাতে চিবাতে চিন্তা শুরু করবেন। তাঁর আজ রাতের  
চিন্তার বিষয় ঠিক করা আছে। শশাংক পালের যন্ত্রণা দেখে চিন্তাটা মাথায়  
এসেছে। তিনি অতি সাধারণ একজন মানুষ হয়েও অন্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে



পারেন না। পরম করুণাময় আল্লাহপাক কীভাবে তাঁর সৃষ্ট জগতের যন্ত্রণায় নির্বিকার থাকেন! অনন্ত নরকে তাঁর সৃষ্ট প্রাণী মানুষ জ্বলতে পুড়তে থাকবে, আর তিনি থাকবেন নির্বিকার? তাহলে কি তিনি এমন একজন যিনি যন্ত্রণাবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? তাই যদি হয়, তাহলে তো তিনি আনন্দবোধ থেকেও মুক্ত। সেরকমই কিছু হবে। সূরা এখলাসে তিনি বলেছেন, ‘ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফু আন আহাদ।’ যার অর্থ আমার সমকক্ষ কেহই না। মাওলানা মনে করেন— এই অনুবাদ ঠিক না। অনুবাদটা হবে— ‘আমি অন্য কাহারো মতো নই’।

পান নেন।

ইদরিস পান নিলেন। জুলেখা হাতে করে পিঁড়ি নিয়ে এসেছে। সে মাওলানার পাশে পিঁড়ি রেখে পিঁড়িতে বসতে বসতে বলল, আজ রাতে আমিও আপনার মতো চিন্তা করব।

মাওলানা আগ্রহ নিয়ে বললেন, কী নিয়া চিন্তা করবা?

আমার মেয়েটারে নিয়া চিন্তা করব।

তোমার যে মেয়ে হবে এটা তুমি ক্যামনে জানো? ছেলেও তো হইতে পারে। পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে এই রহস্য আল্লাহপাক ভেদ করেন না। জন্মের পরে তিনি রহস্য ভেদ করেন।

জুলেখা বলল, আমার যে মেয়ে হবে এইটা আমি জানি। তাকায়া দেখেন, আমার চেহারা অনেক সুন্দর হয়েছে। এর অর্থ জানেন?

না।

এর অর্থ আমার মেয়ে হবে। মেয়ের মা সুন্দরী, ছেলের মা বান্দরী।

মাওলানা জবাব দিলেন না। ঝড়বৃষ্টির শেষে চৈত্র মাসের মেঘশূন্য আকাশ। এত বড় চাঁদ উঠেছে। নিশ্চয়ই পূর্ণিমা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে জোছনা গলে গলে পড়ছে। কী অপূর্ব দৃশ্য! শশাংক পাল এই দৃশ্য আজ দেখতে পারছেন না। কিংবা কে জানে, এরচে’ও অনেক সুন্দর দৃশ্য তিনি এখন দেখছেন। আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করেছেন। হয়তো তিনি তাকে বলেছেন— পৃথিবীতে শেষ দিনগুলি তোর অনেক কষ্টে গেছে। এখন আয় আরাম কর। তোকে দিলাম চিরযৌবন।

জুলেখা মিষ্টি করে ডাকল, মীরার বাপ!

মাওলানা চমকে উঠে বললেন, কী বললা?

জুলেখা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, আপনারে মীরার বাপ বলে ডাকলাম। আমি আমার মেয়ের নাম রাখব মীরা।

হিন্দু নাম?

নামের কোনো হিন্দু মুসলমান নাই। নাম নামাজ রোজা করে না, পূজা করে না। নাম মানুষের একটা পোশাক। পোশাকের কি কোনো ধর্ম থাকে ?

ইদরিস বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমার ভালো বুদ্ধি।

জুলেখা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি আমার ভালো বুদ্ধি। মানুষ আমার রূপটা শুধু দেখে, বুদ্ধি দেখে না। আপনি দেখেছেন, আমার ভালো লাগল।

ইদরিস বললেন, আরেকটা পান খাব।

জুলেখা বলল, পান দিতেছি। তার আগে একটা কথা বলি, মন দিয়া শুনেন। শশাংক পাল আপনারে একটা গোপন কথা বলেছে, আপনি যেটা আমারে বলেন নাই। আমার একটা গোপন কথা আছে, সেটা আপনারে এখন বলব।

বলো।

আমার মেয়েটার জন্মের পর আমি আপনারে ছেড়ে চলে যাব।

মাওলানা অবাক হয়ে বললেন, কেন ?

জুলেখা স্বাভাবিক গলায় বলল, আমার কারণে আপনি বিরাট বিপদে পড়েছেন। সমাজে পতিত হয়েছেন। নামাজ কালাম ছেড়েছেন। মাথা খারাপের দিকে যাইতেছেন। আমি আপনারে মুক্তি দিব।

মেয়েটাকে কি নিয়ে যাবে ?

না। তাকে আপনার কাছে দিয়া যাব। আপনি মেয়েটারে ভালো মানুষ হওয়া শিখাইবেন। আমি চাই আমার মেয়ে আপনার মতো ভালো মানুষ হোক।

জুলেখার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। গাল ভেজা। ভেজা গালে চাঁদের আলো চকচক করছে। মাওলানা বিস্মিত হয়ে বললেন, কাঁদতেছ কেন ?

জুলেখা সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে বলল, আর কাঁদব না। বলেই সে ফিক করে হাসল। মাওলানা মুগ্ধ হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর স্ত্রী যে পৃথিবীর অতি রূপবতীদের একজন এটা তাঁর মনেই থাকে না। হঠাৎ হঠাৎ বুঝতে পারেন। তখন তাঁর বড় বিস্ময় লাগে। পবিত্র কোরান শরিফে বেহেশতের আয়তচক্ষু হুরদের বর্ণনা আছে। তারা কি জুলেখা নামের এই মেয়ের চেয়েও সুন্দর ? আল্লাহপাক যখন বলেছেন তখন অবশ্যই সুন্দর। কিন্তু সেই সৌন্দর্য কী রকম ? কাকে আমরা সৌন্দর্য বলি ? ফুল সুন্দর লাগে কেন ? পাতাকে ফুলের মতো সুন্দর লাগে না, অথচ ফুলকে লাগে। ফুলের গন্ধ আছে এইজন্যে কি ? গন্ধ ছাড়াও তো ফুল আছে। সেই ফুলও তো সুন্দর।



জুলেখা বলল, কী চিন্তা করেন ?

মাওলানা জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।  
সেই চন্দ্রও সুন্দর লাগছে। সুন্দর তাহলে কী ?

জুলেখা বলল, গান শুনবেন ?

মাওলানা বললেন, না। গানবাজনা নিষেধ আছে।

নিষেধ থাকলেও শুনেন। আপনারে গান শুনাইতে ইচ্ছা করতেছে।  
বেহেশতে হৃদয়ের গান শুনবেন। দুনিয়াতে আমি শুনাব। তখন তুলনা করবেন।

জুলেখা, গান শুনব না।

আপনে চন্দ্র দেখতেছেন। আমি চন্দ্র নিয়া গান করব।

বলেই জুলেখা গান শুরু করল।

ও আমার চন্দ্রসখারে  
তোমার কারণে হইলাম দিওয়ানা  
ও আমার চন্দ্রসখারে  
মিছামিছি হইছি দিওয়ানা।

আকাশের চাঁদের দিকে আরো একজন তাকিয়ে আছে। তার নাম লাবুস। সে  
বসে আছে লঞ্চঘাটায়। মাঝরাতে ভেঁপু বাজিয়ে লক্ষ্মী নেভিগেশন কোম্পানির  
শেষ লঞ্চ গোয়ালন্দ থেকে আসে। দূরের লঞ্চটাকে মনে হয় ঝাড়বাতি।  
ঝাড়বাতিটা আস্তে আস্তে লঞ্চের আকৃতি নেয়। দেখতে ভালো লাগে।

আজকের দিনটা লাবুসের ভালো কেটেছে। দুপুরে খাওয়া না হলেও সন্ধ্যায়  
ভরপেট খেয়েছে। খাওয়ার আয়োজন শশাংক পালের বাড়িতে। শ্মশানযাত্রীদের  
জন্যে খিচুড়ির আয়োজন ছিল। খিচুড়ি খেতে কেউ আসে নি।

লাবুস কলাপাতা নিয়ে বসেছে। বাবুর্চি কলাপাতায় খিচুড়ি ঢালতে ঢালতে  
বলল, শ্মশানযাত্রীর খাওয়া খায় মুসলমানে! এর নাম কলিকাল।

লাবুস বলল, অভাবের কোনো হিন্দু মুসলমান নাই।

বাবুর্চি বলল, কথা কইস না। মুখ বন্ধ কইরা থা। যত পারস থা। পাঁচ সের  
চাউলের খিচুড়ি। সব নষ্ট।

লাবুস মুখ বন্ধ করেই খেয়ে গেল। তিন-চারদিনের খাবার একসঙ্গে খেয়ে  
ফেলার ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা থাকলে সে খেত। তাহলে আগামী কয়েকদিন তাকে  
আর খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হতো না। মানুষ হবার প্রধান সমস্যা, সে জরুরি

কোনো জিনিসই জমা করে রাখতে পারে না। দিনের খাবার দিনে খেতে হয়।  
দিনের ঘুম দিনে ঘুমাতে হয়। খাওয়া এবং ঘুম কোনোটিই জমা রাখা যায় না।

লঞ্চ ভোঁ দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁকের ভেতর থেকে তাকে দেখা  
যাবে। আজ আকাশে থালার মতো চাঁদ। চাঁদের আলো এবং লঞ্চের আলো  
মিলেমিশে কী সুন্দর দৃশ্যই না হবে! সুন্দর দৃশ্য দেখার আকুলতা লাবুসকে  
ব্যাকুল করল।

তার মতো আরো একজন ব্যাকুল হলেন। তিনি বহুদূর দেশ আমেরিকায়  
বাস করেন। তাঁকে বলা হয় 'জঙ্গলের কবি'। নাম রবার্ট ফ্রস্ট। তিনি জঙ্গলের  
আলোছায়ায় হেঁটে বেড়ান। এবং প্রায়ই বলেন, অদ্ভুত সুন্দর এই পৃথিবীর সঙ্গে  
তাঁর প্রেমিকের কলহের মতো কলহ।

I had a lover's quarrel with the world.  
And were an epitaph to be my story  
I'd have a short one ready for my own.  
I would have written of me on my stone;  
I had a lover's quarrel with the world.





বান্ধবপুর বাজারে এককড়ি সাহার চালের আড়ত। তিনি সামান্য পুঁজি দিয়ে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের কারণে এখন রমরমা অবস্থা। ধান-চালের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। আরো বাড়বে— এরকম গুজব বাতাসে ভাসছে। সব চাল না-কি মিলিটারিরা কিনে নিবে। পাউরুটি খেয়ে যুদ্ধ করা যায় না। ভাত খেয়েও যুদ্ধ হয় না। ভাতে ঘুম পায়। তারপরেও মিলিটারিদের জন্যে রাতে ভাতের ব্যবস্থা। রাতে ভাত খেয়ে তারা আরামে ঘুমায়। দিনে যুদ্ধ শুরু হয়। দেশের চাল সব সরকার কিনছে। এদিকে আবার বার্মা মুলুক থেকে চাল আসা বন্ধ। জাপানিরা বার্মা দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকবে। নাক-চ্যাপটা মগগুলিকে শায়েস্তা করবে। এটা একটা আশার কথা।

এককড়ি সারাদিন ক্যাশবাক্স নিয়ে আড়তে বসে থাকেন। তাঁর মন প্রফুল্ল থাকলেও চোখেমুখে গভীর বিষণ্ণতা ফুটিয়ে রাখেন। ব্যবসা ভয়ঙ্কর খারাপ যাচ্ছে। যুদ্ধের কারণে তিনি ধনে-প্রাণে মারা পড়বেন— এই ধরনের কথা বলতে পছন্দ করেন। কথা বলার জন্যে সবসময় লোক পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার দিকে অনেকেই আসে। যুদ্ধের খবর শুনতে আসে। এককড়ির নামে প্রতিদিন কলিকাতা সমাচার পত্রিকা আসে। দিনেরটা দিনে আসে না, দু’দিন পরে আসে। তাতে সমস্যা কী? খাবার দু’দিনে বাসি হয়, খবর কখনো বাসি হয় না। সবাইকে সেই পত্রিকা পড়ে শোনানো হয়। পড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন গৌরঙ্গ চক্রবর্তী। তাঁর গলা উঁচু এবং সুরেলা। বিভিন্ন পূজা পার্বণে তিনি সুরেলা গলায় মাথা দুলিয়ে যখন ব্রতকথা পাঠ করেন, তখন ভক্তিমতি হিন্দু নারীদের চোখে আবেগে পানি আসে।

‘বিদেশে গেল পতি,  
সে হতে সাবিত্রী সতী  
দিবা রাতি করিছে রোদন  
পতির বিরহে তার  
দেহ হলো চর্মসার,  
ছয় জায়ে করিছে গঞ্জন।’

কলিকাতা সমাচার এককড়ি প্রথম পড়েন। যে কাগজটা খরচপাতি করে আনায় সে-ই প্রথম পড়বে এটাই নিয়ম। এককড়ি সময় নিয়ে পড়েন। খবরের কাগজ পাঠ যারা শুনতে এসেছে তাদের আগ্রহ এবং কৌতূহল বাড়ানোর জন্যে দু'একটা মন্তব্য করেন। দু'একটা শিরোনাম গলা খাঁকারি দিয়ে নিজেই পড়েন।

ইংল্যান্ডে বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ  
ব্রিটিশ সিংহ কম্পমান

ফ্রান্সের গভীরে অপ্রতিরোধ্য হিটলার

অপেক্ষমাণ জনতার একজন বলে বসল, হিটলার বাবাজি দেহি ফ্রান্সের গুয়া মাইরা দিছে।

এককড়ি চোখের চশমা ঠিক করতে করতে বললেন, অশ্লীল কথা বলবা না দীননাথ।

দীননাথ বিস্মিত হয়ে বলল, 'অশ্লীষ' কথা কোনটা বলছি! সত্য কথা বলছি। হিটলার সবেরেই গুয়া মারতাছে— এটা সত্য কথা, 'অশ্লীষ' না।

গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর কাছে মূল কাগজ চলে এসেছে। তিনি কয়েকবার কেশে, পানি খেয়ে আয়োজন করে পাঠ শুরু করেছেন। শ্রোতাদের চোখ আগ্রহ এবং উত্তেজনায় চকচক করছে। দূরদেশের যুদ্ধ তাদের স্পর্শ করছে না। হিটলার নামে দুর্ধর্ষ একজন সবাইকে নাস্তানাবুদ করছে, ভাবতেই আনন্দ।

গৌরাঙ্গ পড়ছেন— 'একদিনে ৭০ বার বোমা হামলা। চার্চিলের মাথায় হাত।' পড়তে পড়তে গৌরাঙ্গ নিজেও মাথায় হাত দেন। হতাশ ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকান, যেন তিনি নিজে চার্চিল। মাথায় বোমা বর্ষণ চোখের সামনে দেখছেন। শ্রোতারা বড়ই আমোদ পায়।

বান্ধবপুরের লোকজন আগে কখনো হিটলারের নাম শোনে নি। এখন এই নাম চলে আসছে নিত্যদিনের আলোচনায়। যাদের ছেলসন্তান হচ্ছে, তারা সন্তানের নাম রাখছে— হিটলু কিংবা হিটু। হিটলারের সঙ্গে মিল রেখে নাম।

খবরের কাগজ পড়া শেষ হয়েছে। শ্রোতারা যে যার বাড়িতে চলে গেছে। এককড়ি হারিকেন নিভিয়ে দিয়েছেন। কেরোসিনের সাশ্রয় করতে হবে। দাম যেভাবে বাড়ছে, কিছুদিন পর এই বস্তু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। বাইরে চাঁদের আলো আছে। হারিকেন না জ্বালালেও চলে। আধো অন্ধকারে এককড়ি দোকানের কর্মচারীদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। গলা নামিয়ে বললেন, চাল কিনা শুরু কর। দাম কিছু বেশি হলেও কিনবা। বড় নৌকা নিয়ে ভাটি অঞ্চলের দিকে যাও। সেখানে ধান চাল দুইই সস্তা।



কর্মচারীদের একজন বলল, কর্তা, কিনা শুরু করব কবে ? পঞ্জিকাতে শুভ দিন দেখে শুরু করা উচিত না ?

এককড়ির জন্যে তামাক সাজানো হয়েছে। তিনি তামাক টানতে টানতে বললেন, শ্রীগণেশের জন্যে সব দিনই শুভ। তারপরেও চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজার পরে শুরু কর। এককড়ি তামাক টানতে লাগলেন।

বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের সূচনা শুরু হলো। ভয়াবহ এই মন্বন্তরে বঙ্গদেশে ত্রিশ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। বিশ্বযুদ্ধের পাওনা এভাবেই তাদের শোধ করতে হয়। মহান ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অশনি সংকেত'।

বঙ্গদেশের মানুষ এই ধরনের বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে এর আগেও একবার গিয়েছিল। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড ক্লাইভ। তার সময়ের মন্বন্তরে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী মৃত্যুবরণ করে। তাদের মৃত্যু কখনোই শ্যাম সমান ছিল না।

জুমা মসজিদের বর্তমান ইমাম মাওলানা করিম এশার নামাজ শেষ করে ঘরে ফিরছেন। পাকা পুলের কাছে এসে মাওলানা থমকে দাঁড়ালেন। পাকা পুলের রেলিংয়ের ওপর লম্বা কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে সাদা চাদর। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষ হলে মূর্তির হাত-পা নড়ত। বাতাসে গায়ের চাদর নড়ত। সেরকম কিছুই হচ্ছে না, মূর্তি পাথরের মতো স্থির।

করিম আয়াতুল কুরশি পড়ে বুকে ফুঁ দিলেন। পাকা পুল জায়গাটা খারাপ। পুলের কাছেই বিরাট যে তেঁতুলগাছ সেখানে ছায়ামূর্তিরা থাকে। অনেকেই দেখেছে। তিনি আজ প্রথম দেখলেন। তাঁর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এলো। একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে ? শেষ পর্যন্ত করলেন না। জিন-ভূতদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা বিপদজনক। তখন তারা পিছু নেয়।

মাওলানা করিম দ্বিতীয়বার আয়াতুল কুরশি পড়ে হাততালি দিলেন। হাততালির শব্দ যতদূর যাবে জিন-ভূতদের তারচে'ও দূরে যাবার কথা। ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল না। হাততালির শব্দে ফিরে তাকাল। করিম নিজের অজান্তেই ভীত গলায় বলে ফেললেন, তুই কে ?

আমি লাবুস।

এখানে কী করিস ?

কিছু করি না।

পুলের উপরে দাঁড়িয়ে আছস কী জন্যে ? মানুষেরে ভয় দেখানোর জন্যে ? আমি যদি আজ খাবড়ায় তোর দাঁত না ফেলছি। বদমাইশ! পুলের উপর থেকে নাম বললাম।

লাবুস জবাব দিল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে শীতল গলায় বলল, আপনি মাওলানা ইদরিসকে গত জুম্মাবারে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। কেন দিলেন ?

করিম বললেন, তোর কাছে জবাবদিহি করব না-কি হারামজাদা ? সে কাফেরের কাজ করেছে বলে কাফের ফতোয়া দিয়েছি। হিন্দুর মুখাগ্নি করেছে। খবর রাখস না ?

লাবুস বলল, লাশের মুখে আগুন দিয়েছে। লাশের আবার হিন্দু-মুসলমান কী ? লাশ নামাজ কালাম পড়ে না। মন্দিরে ঘণ্টাও বাজায় না।

বাপরে বাপ! জ্ঞান ফলায়। দেওবন্দের প্রিন্সিপাল স্যার আসছেন। হারামজাদা, তুই জানস না ইদরিস এক বেশ্যামাগির সাথে সংসার করতেছে ? মাগির পেটও বাঁধায়ে ফেলেছে।

জুলেখা লাবুসের মা। করিমের কঠিন কথাতে লাবুসের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সে আগের মতোই শান্ত গলায় বলল, মাওলানা ইদরিসকে কাফের বলার কারণে আজ আমি আপনাকে শান্তি দিব। এমন শান্তি যে জনমে ভুলবেন না। যতদিন বাঁচবেন ইয়াদ থাকবে।

করিম থমকে গেলেন। বদমাইশটার কথা বলার ধরন ভালো না। ছুরি চাকু চালাবে কি-না কে জানে ! লাবুসের হাতে অবশ্যি ছুরি চাকু কিছু দেখা যাচ্ছে না। বদমাইশটা চাদরের নিচে লুকিয়ে রাখতে পারে। মনে হয় তাই করেছে। চৈত্র মাসের গরমে গায়ে চাদর থাকার কথা না।

করিম বললেন, কী শান্তি দিবি ?

লাবুস বলল, আমি আপনাকে ন্যাংটা করে ছেড়ে দিব। ন্যাংটা অবস্থায় দৌড়াতে দৌড়াতে আপনি ঘরে যাবেন। আপনার স্ত্রী দরজা খুলে দেখবে ন্যাংটা ইমাম।

এই হারামজাদা! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

লাবুস রেলিং থেকে নামতে নামতে বলল, মাথা খারাপ হয় নাই।

করিম উল্টাদিকে দৌড় দেবেন কি-না বুঝতে পারছেন না। এই হারামজাদা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। এর বেশি কিছু না। এইসব ক্ষেত্রে ভয় পেতে নাই। ভয় পেলেনই হারামজাদা বুঝতে পারবে, আরো লাই পাবে।



লাবুস করিমের দিকে এগুচ্ছে। ছোট ছোট পা ফেলে এগুচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। করিম দ্রুত ভাবছেন, এখনো দৌড় দেয়ার সময় আছে। তবে দৌড় দেয়াটা হবে বিরাট বোকামি।

লাবুস বলল, পাঞ্জাবিটা খুলে আমার হাতে দেন।

করিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পাঞ্জাবির ওপর দিয়ে যাচ্ছে। উদম গায়ে বাজারের ভেতর দিয়ে যাওয়াও লজ্জার ব্যাপার। তারপরেও কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবেন— অতিরিক্ত গরমের কারণে পাঞ্জাবি খুলে রেখেছেন। কথা মিথ্যাও হবে না। আজ অতিরিক্ত গরম পড়েছে। পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

করিম পাঞ্জাবি খুলে লাবুসের হাতে দিতে দিতে বললেন, পাঞ্জাবি নিয়ে বাড়িত যা। অপরাধ যা করেছিস তার ক্ষমা নাই। তবে আজ আর কিছু বলব না। কোনো একদিন ফয়সালা হবে।

লাবুস বলল, এখন লুঙ্গি খুলে আমার হাতে দেন।

কী বললি ?

একবার তো বলেছি। আবার বলি, লুঙ্গি খুলে আমার হাতে দেন। নিজে না দিলে আমি টান দিয়া খুলব।

করিমের হাত-পা জমে গেল। তাঁর কান দিয়ে মনে হচ্ছে ধোঁয়া বের হচ্ছে। চোখ ঝাপসা।

মেঘের ভেতর থেকে চাঁদ বের হয়েছে। ফকফকা চাঁদের আলো। করিম দুই হাতে লজ্জা ঢেকে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লাবুসের হাতে মাওলানার লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। লাবুস সহজ গলায় বলল, বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে পারবেন না। বাজারে হরিণাম জপ হচ্ছে। নদীর পাড় দিয়ে চলে যান। কেউ দেখবে না।

বাজারের দিক থেকে বিড়ি টানতে টানতে কে যেন আসছে। দূর থেকে বিড়ির আগুনের ওঠা-নামা দেখা যাচ্ছে। করিম রাস্তা ফেলে নদীর পাড়ের দিকে দৌড় দিলেন। রাত তেমন বেশি হয় নি। ঘাটের নৌকার মাঝিরা নিশ্চয়ই জেগে আছে। তাদের কেউ-না-কেউ অবশ্যই দেখবে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ভালো। রাত গভীর হলে বাড়ি ফিরবেন। জঙ্গলে বসে থাকারও হাজার সমস্যা আছে। সাপখোপের সমস্যা। অতিরিক্ত গরমে তারা সবাই গর্ত থেকে বের হয়েছে। পালপাড়ার এক বৌ গত বুধবার দুপুরে সাপের কামড়ে মারা গেছে। কচুর লতির সন্ধানে সে জঙ্গলে ঢুকেছিল। কচুগাছের নিচে হাত দেয়া মাত্র সাপ ঠোকর দিল। আল্লাহ মাবুদ জানে— তাঁর কপালে সাপের হাতে মৃত্যু আছে কি-না।

করিমের বাড়ি বাজারের শেষপ্রান্তে। তিনি বছরখানেক আগে ভাটি অঞ্চলের এক মেয়ে বিয়ে করেছেন। মেয়ের বয়স অল্প। কিশোরীর মায়া তার চোখ-মুখ থেকে যায় নি। তার নাম শরিফা। সে উঠানে হারিকেন জ্বালিয়ে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছে। বাজারে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা হচ্ছে। উঠান থেকে মোটামুটি শোনা যায়। শরিফার শুনতে ভালো লাগছে। যদিও পরের ধর্মকথা শোনা ঠিক না। পাপ হয়। শরিফার প্রায়ই মনে হয় মুসলমানদের মধ্যে গানবাজনা করে ধর্মকথা বলার ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো।

গৌরাসের মিষ্টি গলার সঙ্গে মৃদঙ্গের বাড়ি, শরিফা আগ্রহ নিয়ে শুনছে।

কহিব তোমাকে আমি পূজার বিষয়।

সওয়া সের আটা কিংবা আতপের গুঁড়ি।

কাঁচা দুগ্ধ সওয়া সের, কলা সওয়া কুড়ি।

সওয়া সের ইক্ষুগুড় সেবার প্রমাণ।

সওয়া সের গুয়া লাগে, সওয়া কুড়ি পান।

সওয়া সের সওয়া মন যে যেভাবে পারে

মুদ্রা যদি থাকে তবে নানা উপাচারে—

বেড়ার বাইরে কে যেন গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকল, ইমাম সাহেব বাড়ি আছেন ?

শরিফা চমকে উঠল। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। কথা না বললে মানুষটা উঠানে ঢুকে পড়তে পারে, সেটা আরো বিপদের।

ইমাম সাহেব বাড়ি ফিরেন নাই ?

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, না।

পুরুষকণ্ঠ বলল, মা! আমার নাম লাবুস। ইমাম সাহেবের কিছু জিনিস আমার কাছে। যদি অনুমতি দেন উঠানে রেখে যাই।

যে পুরুষ 'মা' সম্বোধন করেছে তাকে ভেতরে ঢোকানো অনুমতি দেয়া যায়। শরিফা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। দরজার আড়াল থেকে বলল, রেখে যান।

লাবুস উঠানে ঢুকল। যুবা পুরুষের গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ভিনদেশের কোনো রাজপুত্র পথ ভুলে চলে এসেছে। শরিফার মনে হলো, এমন রূপবান পুরুষ সে তার জীবনে দেখে নি। আর এই যুবা পুরুষটার কী অদ্ভুত নাম— লাবুস।

শরিফা আর কথা বলবে না ঠিক করে রাখার পর বলল, আপনি হিন্দু না মুসলমান ?



আমি মুসলমান। মা, আসসালামু আলায়কুম।

শরিফা বিব্রত গলায় বলল, ওয়ালাইকুম সালাম।

লাবুস বলল, মা, আমি সারাদিন খাই নাই। খুবই ক্ষুধার্ত। ঘরে কিছু কি আছে? চিড়া, মুড়ি, একটা কিছু হলেই হবে।

আপনি দাওয়ায় জলচৌকিতে বসেন। খাওয়া আনতেছি। কলসিতে পানি আছে। হাত-মুখ ধোন।

লাবুস বলল, আপনাকে মা ডেকেছি— আমাকে তুমি করে বলবেন।

শরিফা অতি দ্রুত খাওয়ার ব্যবস্থা করল। গরম ভাত। খলিসা মাছের ঝোল, পাট শাক, ডাল।

বারান্দায় পাটি পেতে খাওয়ার নিখুঁত আয়োজন। পাতে লবণ দেয়া, কাগজি লেবুর টুকরা, কাঁচামরিচ, একটা বাটিতে পাতে খাওয়ার ঘি।

শরিফা দরজার আড়াল থেকে ক্ষীণ গলায় বলল, আয়োজন কিছুই নাই, আমি শরমিন্দা। তোমারে দাওয়াত দিলাম। একদিন আসবা। পোলাও করব, মুরগির কোরমা করব।

লাবুস মাথা কাত করে বলল, জি আচ্ছা।

খাওয়া শেষ করে লাবুস উঠানে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহপাক, আমাকে আমার নতুন মা যে যত্নের সঙ্গে খানা দিয়েছেন, তাঁকে সারাজীবন যেন কেউ না কেউ এরকম যত্ন করে খাওয়ায়।

অদ্ভুত এই দোয়ার কথা শুনে শরিফার চোখে পানি এসে গেল।

আহারে বেচারা, ঘরে কিছুই ছিল না, তারপরেও কত তৃপ্তি করে খেয়েছে। কী সুন্দর করে দোয়াটা করেছে! প্রিয়জন কেউ কি এর নাই? সে কি পথে পথে না খেয়ে ঘুরে?

তোমার পরিচয় কী?

আমার কোনো পরিচয় নাই।

পরিচয় থাকবে না এটা কেমন কথা! আমারে মা ডেকেছ, খুশি হয়েছে। তোমার আসল মা কে?

আমার কোনো মা নাই। এখন আমারে বিদায় দেন, আমি যাই।

কলাপাতায় শরীর ঢেকে ইমাম করিম কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে গভীর রাতে ফিরলেন। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। শরীর কাঁপছে। হতভম্ব শরিফা বলল, আপনার কী হয়েছে?

করিম বিড়বিড় করে বললেন, আগে গোসলের পানি দেও। গামছা দেও।  
জিনের হাতে পড়েছিলাম। জীবনসংশয় হয়েছিল। অনেক কষ্টে জানে বাঁচছি।

কন কী আপনি ?

করিম বলল, তুমি কি ভাবছ মিথ্যা বলতেছি ? যা বলতেছি সবই সত্য।  
জিনের নাম খোররম। সে থাকে কোহকাফ নগরে। এশার নামাজের পর বাড়ি  
ফিরতেছি, সে আমার পিছু নিছে। কখনো থাকে পিছে, কখনো চইলা আসে  
সামনে। তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সূরায়ে জিন পাঠ শুরু করলাম— এইখানে  
হইল সমস্যা।

কী সমস্যা ?

ভয়ের কারণে মাঝখানে আমার দোয়া বিস্মরণ হলো। ‘ওয়া আল্লা জনান না  
আললান তাকুলাল ইনসু’ পর্যন্ত পড়েছি, তারপর আর কিছু মনে আসে না। মাথা  
গেল আউলায়া, তখন জিন আইসা আমারে চাইপা ধরল। টান দিয়া নিয়া গেল  
জঙ্গলায়। পাছড়াপাছড়ি কামড়াকামড়ি।

কী সর্বনাশ!

একসময় জ্ঞান হারাইলাম। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি ন্যাংটা হইয়া কাদার  
মধ্যে শোয়া। জানে যে বাঁচছি এইজন্য আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া।

ভয়ঙ্কর এই কথা শোনার পর শরিফা লাবুসের কথা চেপে গেল। সে যে  
ইমাম সাহেবের পাঞ্জাবি-লুঙ্গি দিয়ে গেছে, এটাও তো একটা রহস্য। আচ্ছা  
এমন কি হতে পারে— লাবুস নামে যে এসেছে, সে-ই জিন খোররম ? মানুষের  
বেশ ধরে এসেছে। তাকে মা বলে ডেকেছে। খাওয়া-দাওয়া করেছে। অনেক  
রাত পর্যন্ত শরিফা জেগে রইল। একসময় সে পুরোপুরি নিশ্চিত হলো, জিন  
খোররমের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছে। মানুষ এত সুন্দর হয় না। মানুষ এত  
গরমে চাদর গায়ে রাখে না। শরিফার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। পাশেই তার স্বামী  
অঘোরে ঘুমাচ্ছে। শরিফার ইচ্ছা করছে স্বামীকে ডেকে তুলে জিন খোররমের  
সাথে তার দেখা হওয়ার গল্পটা করে।

লাবুস ভালো ঝামেলায় আছে। অনাহারের ঝামেলা। এত বেলা হয়েছে, এখনো  
খাবারের কোনো ব্যবস্থা হয় নি। দুপুরে মাওলানা ইদরিসের বাড়ির কাছে গিয়ে  
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলো। ওই বাড়িতে তার মা জুলেখা থাকে।  
মায়ের সঙ্গে দেখা করার তার কোনো ইচ্ছা নেই।



সে রওনা হলো জংলার কালীবাড়ির দিকে। দেবীকে ভোগ হিসেবে কেউ কেউ হঠাৎ একটা দু'টা পয়সা ছুড়ে দেয়। একবার এখান থেকেই একটা এক আনি পেয়েছিল।

কালীবাড়িতে কোনো পয়সা-কড়ি পাওয়া গেল না। কেউ একজন কলাপাতায় ক্ষীর দিয়ে গেছে। দুনিয়ার পিঁপড়া ক্ষীরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পিঁপড়ার খাওয়া দেখে সে জঙ্গলে ঢুকল। জঙ্গলে বুবি গাছে (লটকন) পাকা বুবি আছে। যত ইচ্ছা খাওয়া যায়। সমস্যা একটাই, বুবি খেলে ক্ষুধা যায় না, বরং আরো বাড়ে। সে জঙ্গলে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল। জংলি কিছু কলাগাছ আছে। আঙুলের মতো ছোট ছোট কলা ধরেছে। এই কলা সে আগেও খেয়ে দেখেছে— তিতা এবং ভয়ঙ্কর কষটা। জোর করে খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রবল বমিভাব হয়।

জঙ্গলের মাঝখানে জলা জায়গায় হুটপুট শব্দ হচ্ছে। লাবুস সেদিকে এগিয়ে গেল। কেউ বরশি পুঁতে রেখেছে, সেখানে মাছ ধরা পড়েছে। প্রায় দুই হাত লম্বা এক বোয়াল। বর্শি ছেঁড়ার প্রাণান্ত চেষ্টায় সে ক্লান্ত। লাবুস বোয়ালটা ডাঙ্গায় তুলল। আগুনে পুড়িয়ে খেলে ভালো হবার কথা। আগুন জ্বালাবার কোনো সরঞ্জাম তার কাছে নেই। মাছটা কাঁচা খাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। যদিও তার মনে হচ্ছে, সে চোখ বন্ধ করে কাঁচা খেতেও পারবে। জংলি মানুষরা তো একসময় কাঁচা মাছ খেত। তাদের সমস্যা না হলে তার হবে কেন?

আগুনের উদ্দেশ্যে লাবুস জংলা থেকে বের হলো। তার চাদরের নিচে বোয়াল মাছ লুকানো। আগুন পাওয়া কঠিন হবে। যুদ্ধের বাজারে দেয়াশলাইয়ের দাম তিনগুণ হয়েছে। লাবুস বাজারের দিকে হাঁটা ধরল। দেয়াশলাই জোগাড় হবে কি-না বুঝতে পারছে না। কেউ তাকে মাগনা দেয়াশলাই দেবে না। হিন্দু পাইস হোটেলের সামনে থমকে দাঁড়াল। রান্নার কী সুন্দর গন্ধ আসছে! পাইস হোটেলের মালিক নিবারণ বলল, দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া থাকবি না।

লাবুস বলল, কর্তা, ভাত খাব।

নিবারণ বলল, ভাত যে খাবি পয়সা আছে?

লাবুস বলল, পয়সা নাই। একবেলা খাওয়ার বিনিময়ে এই মাছটা আপনারা দিব।

লাবুস চাদরের নিচ থেকে মাছ বের করল। বোয়াল মাছের প্রাণশক্তি ভালো। সে এখনো জীবিত। কানকো নড়ছে।

নিবারণ বলল, খেতে বস। বাইরে বসে খাবি। মুসলমানের ভিতরে ঢোকা নিষেধ। অন্যের খাওয়া নষ্ট হয়। যা কলাপাতা কেটে নিয়ে আয়।

সবুজ কলাপাতায় ধবধবে সাদা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। ঝিঙা দিয়ে রাঁধা লাবড়া, সঙ্গে মলা মাছের ঝোল। খেতে খেতে লাবুসের মনে হলো, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ভরপেট খাওয়ায়। এইজন্যেই হয়তো বেহেশতে খাওয়া-খাদ্যের বর্ণনায় এত জোর দেয়া হয়েছে।

লাবুসের কলাপাতার ভাত শেষ হয়েছে। সে হাত গুটিয়ে বসে আছে, তার দৃষ্টি পাচক বামুনের দিকে।

নিবারণ বলল, আই এরে আরো ভাত দে, ডাল দে। পেটে ক্ষুধা নিয়ে কেউ আমার দোকান থেকে উঠবে, এটা ঠিক না। এতে অনুপূর্ণা অসন্তুষ্ট হন।

লাবুস যখন খাচ্ছিল, তখনি বেঙ্গল নেভিগেশনের লঞ্চের ধনু শেখ বাকুবপুরের ঘাটে এসে নামেন। পা কাটা যাবার পর এই প্রথম তিনি নিজ গ্রামে এসেছেন। যে লঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে আগে তিনি চোখ বন্ধ করে নামতেন, আজ সেই সিঁড়ি দিয়ে তাকে কোলে করে নামানো হচ্ছে। কী লজ্জার কথা! দুনিয়ার মানুষও জড়ো হয়েছে লঞ্চঘাটে। যেন তারা জীবনে কখনো এক ঠ্যাং-এর মানুষ দেখে নাই। সব বদের দল। ধনু শেখের ইচ্ছা করছে দু'নলা বন্দুক দিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করেন, যাতে ভয়ে লোকজন ছুটে পালায়। তিনি নিরিবিলিতে নামতে পারেন।

ধনু শেখকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে চেয়ারের হাতলে বাঁশ বেঁধে বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতি বিরক্তি নিয়ে তিনি চেয়ারে বসে আছেন। চারজন মিলে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হয়েছে পাক্কির মতো। পাক্কির ভেতরে বসে থাকা মানুষ দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।

চেয়ারের পেছনে পেছনে বালক-বালিকার বিশাল এক বাহিনী। ধনু শেখের লোকজন ধমক ধামক দিয়েও এদের দূর করতে পারল না। এমন মজার দৃশ্য তারা অনেক দিন দেখে নি। যতক্ষণ দেখা সম্ভব ততক্ষণ তারা দেখবেই।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, খামাকা পিছে পিছে না এসে স্লোগান দে। বল, খান বাহাদুর ধনু শেখ জিন্দাবাদ।

শিশুরা মহাআনন্দে জিন্দাবাদ দিতে লাগল। এত আমোদ তারা অনেক দিন পায় নি।

রাত আটটার মতো বাজে। বাকুবপুরের বেশির ভাগ মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। ধনু শেখ জেগে আছেন। তিনি এখনো রাতের খাওয়া খান নি। রান্নাবান্নার আয়োজন



হচ্ছে। রাতে তিনি মাছ খান না। তাঁর জন্যে খাসি জবেহ হয়েছে। কোলকাতায় খাসির মাংস বলে যা পাওয়া যায়, সবই পাঁঠা। হাজার মসলা দিলেও মাংস থেকে গন্ধ যায় না।

ধনু শেখের মদ্যপানের অভ্যাস ছিল না। পা কাটা যাবার পর সামান্য মদ্যপান শুরু করেছেন। জাহাজে করে কোম্পানির লোকজনের জন্যে বিলাতি বোতল আসে। নানা যন্ত্রণা করে তিনি সেখান থেকে বোতল সংগ্রহ করেন। মাঝে মাঝে বিম্বিত হয়ে ভাবেন, ইংরেজ জাতি কত উন্নত। এরা যখন মদ বানায়, সেই মদও উন্নত। আমরা এখনো পড়ে আছি ধেনু মদে। এতই দুর্গন্ধ যে নাক চাপা দিয়ে খেতে হয়।

ধনু শেখ লাবুসকে খবর দিয়ে এনেছেন। সে অনেকক্ষণ থেকে ধনু শেখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধনু শেখ কয়েকবার তার দিকে তাকিয়েছেন, কিছু বলেন নি। নিজের মনে ডাবের পানি মেশানো ‘জিনে’র বোতলে চুমুক দিয়েছেন। এইবার তিনি কথা শুরু করলেন—

তোমার নাম লাবুস ?

হ্যাঁ।

ইঁ হ্যাঁ করছ কেন ? আদব লেহাজ ভুলেছ ? কার সঙ্গে কথা বলতেছ বিস্মরণ হয়েছে ? আমি খান বাহাদুর। আদবের সঙ্গে কথা বলবা। বলো জি।

জি।

সুলেমানের পুত্র ?

জি।

সুলেমান কোথায় ?

উনি ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে গেছিলেন, আর ফিরেন নাই।

ধনু শেখ আনন্দিত গলায় বললেন, ঘোড়ায় যেতে যেতে ইউরোপে চলে গেছে কি-না খোঁজ নাও। দেখা গেল যুদ্ধের মধ্যে পড়েছে। হা হা হা।

লাবুস বলল, আপনি কী জন্যে আমাকে ডেকেছেন ?

ধনু শেখ ভুরু কুঁচকে বললেন, এত তাড়া কী জন্যে ? তুমিও কি ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষায় বের হবে ? গায়ে চাদর কেন ? গরমের মধ্যে চাদর, ঘটনা কী ?

লাবুস চুপ করে রইল।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, প্রশ্ন করলে জবাব দিবা। আল্লাহপাক বোবা বানাতে তুমি বোবা। নিজ থাইকা বোবা সাজবা না। গায়ে চাদর কেন ?

লাবুস বলল, আমার কাপড় নাই, চাদর দিয়া নিজেরে ঢাইকা রাখি।

ধনু শেখ চারমিনার সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সিগারেট ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, বাপের মতো ভিক্ষায় বাইর হও নাই কেন ? পিতা ভিক্ষুক পুত্রও ভিক্ষুক। ভিক্ষুক বংশ।

লাবুসের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। সে কিছু বলল না। এই মানুষটা শশাংক পালের মতো কথা বলছে। খুবই আশ্চর্যের কথা, কিছু কিছু মানুষ একইভাবে চিন্তা করে। তাদের পরিণতিও হয় একই।

ধনু শেখ বললেন, তোমাকে বিশেষ কারণে ডেকেছি। রসালাপ করার জন্যে ডাকি নাই। রসালাপ করতে হয় অল্পবয়সি মেয়েছেলের সাথে। বুঝেছ ?

বুঝেছি।

হরিচরণের বিশাল বিষয়সম্পত্তি, সব তিনি যে তোমারে দানপত্র করে দিয়েছেন সেটা জানো ?

না।

দানপত্রের মূল কপি আমার কাছে আছে। দানপত্র নিয়া যাও— মুফতে যে জিনিস পেয়েছ ভোগ কর। তার আগে সাবান ডলে ভালোমতো গোসল কর। টাকা দিতেছি— জামাকাপড় কিনো।

ধনু শেখ একশ' রুপির একটা নোট বের করলেন। লাবুস সহজ ভঙ্গিতে নোট হাতে নিল। ধনু শেখ উদার গলায় বললেন, রাতে আমার সঙ্গে খানা খাবে। পোলাও খাসির মাংস।

এত বড় একটা ঘটনা জানার পরেও একটা ছেলে এত নির্বিকার কেন ধনু শেখ ভেবে পেলেন না। পাগল না তো ! সুস্থ মাথার মানুষ হলে আনন্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত।

লেখাপড়া কিছু জানো ?

অল্প জানি।

যুদ্ধ যে চলতেছে এইটা জানো ?

শুনেছি।

কার সাথে কার যুদ্ধ ?

জার্মানি আর জাপানের সাথে সারা দুনিয়ার যুদ্ধ।

আমরা ভারতবাসী কার সাথে আছি ?

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে।

উনি কোথায় ?

উনি ইংরেজের হাতে বন্দি।



যুদ্ধে কে জিতবে ?

কেউ জিতবে না, তবে হিটলার হারবে। জাপানে দুইটা বড় বোমা পড়বে। জাপান হারবে।

ধনু শেখ বললেন, জাপানে দুইটা বড় বোমা পড়বে তোমাকে কে বলেছে ? চার্চিল সাব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন ?

লাবুস বলল, আমি অনেক কিছু চোখের সামনে দেখি।

ধনু শেখ বললেন, তুমি তো বিরাট পীর হয়েছ। শরীরে নাই কাপড়, পেটে নাই ভাত। কিন্তু পীর কেবলা।

লাবুস শান্ত গলায় বলল, এখন তো ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

ধনু শেখ রাগী গলায় বললেন, ব্যবস্থা কে করেছে ? আমি, না-কি হরিচরণ ?

লাবুস জবাব দিল না। ধনু শেখ হঠাৎ লক্ষ করলেন, নোংরা চাদর গায়ে যে যুবক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সে অসম্ভব রূপবান একজন। মদের ঝাঁকে এরকম দেখছেন ? বেশি তো খাওয়া হয় নি। মাত্র তিন গ্লাস।

তুমি নিশ্চয়ই বিবাহ কর নাই ?

জি-না।

আমার কন্যাকে বিবাহ করবা ? তার নাম আতর। আমার মতো তার ঠ্যাং কাটা না। সে ভালো মেয়ে।

লাবুস পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো। তার ঠোঁটে হালকা হাসির আভাস। ধনু শেখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এই ছেলে সত্যি সত্যি হেসে ফেললে তাকে রাম ধোলাই দিতে হবে। বেয়াদবির শাস্তি।

ধনু শেখের নিজের ওপরই রাগ লাগছে। ছুট করে এই ফকিরের পুলাকে মেয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেললেন ? দেশে কি সুপাত্রে অভাব হয়েছে ? তিনি বুঝতে পারছেন যা করেছেন সবই মদের ঝাঁকে করেছেন। এই বস্তু খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ধনু শেখ বললেন, খাম্বার মতো সামনে দাঁড়ায়া থাকবা না। বিদায়।

লাবুস বলল, রাতে আপনার সঙ্গে খানা খেতে বলেছিলেন।

ধনু শেখ বললেন, যা বলেছিলাম ফিরায়ে নিলাম। খান বাহাদুর ধনু শেখ ভিক্ষুকের সাথে খানা খায় না। সামনে থেকে যাও।

লাবুস ঘর থেকে বের হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনু শেখ তার সন্ধান লোক পাঠালেন। তাঁর কাছে মনে হলো, একবার যখন খানা খাওয়াবেন বলে কথা দিয়েছেন তখন কথা রাখা উচিত।

রাত দু'টা বাজে। মাওলানা ইদরিস উঠানে বসে আছেন। উঠানে আলো নেই। আকাশে মেঘ থাকায় চাঁদ বা নক্ষত্রের কোনো আলোও নেই। তাঁর চারদিকে ঘন অন্ধকার। ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভেতর থেকে হারিকেনের সামান্য আলো আসছে। ইদরিস তাকিয়ে আছেন আলোর দিকে। তাঁর মন সামান্য বিষণ্ণ। শশাংক পালের বিষয়ে একটা কথা শোনা যাচ্ছে। সে না-কি মরে ভূত হয়েছে। অনেকেই শ্মশানঘাটে তাকে দেখেছে। নগ্ন অবস্থায় নদীর পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে। কাউকে দেখতে পেলে দুঃখিত গলায় বলে, এইটা কী করলা? একজন মুসলমানেরে দিয়া আমার মুখাগ্নি করাইলা? এই কারণে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছি। গয়ায় পিণ্ডিদানের ব্যবস্থা কর। আমারে উদ্ধার কর।

গয়ায় পিণ্ডিদানের বিষয়টা কী ইদরিস জানেন না। যারা জানে তারাও এই বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিবে বলে মনে হয় না। পিণ্ডি দেওয়ার কাজটা কি কোনো মুসলমান করতে পারে? পারলে তিনি করতে রাজি আছেন। সমস্যা একটাই, গয়াকাশি যাবার মতো অর্থসংস্থান তাঁর নেই। তবে তাঁর ধারণা, মুখাগ্নির মতো পিণ্ডিদানের ব্যবস্থাটাও হিন্দুদের করতে হবে। তাঁকে দিয়ে হবে না।

গয়াকাশি না গেলেও মাওলানাকে একবার বগুড়ার মহাস্থানগড়ে যেতে হবে। শশাংক পাল মৃত্যুর আগে তাকে এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেখানে ললিতা নামে এক মেয়েকে খুঁজে বের করে বলতে হবে— বান্ধবপুরের এক সময়ের জমিদার বাবু শশাংক পাল তোমার পিতা। জীবিত অবস্থায় এই খবর তিনি তোমাকে দিতে পারেন নাই বলে তিনি বিশেষ লজ্জিত। তিনি তোমার জন্যে কিছু উপহার রেখে গেছেন। দশটা সোনার মোহর। বিশেষ একটা জায়গায় মাটিতে গর্ত করে পোঁতা।

জুলেখা দরজায় এসে দাঁড়াল। হাই তুলতে তুলতে বলল, একটু ভিতরে আসবেন? খাটের নিচে সাপ। সাপটা বিদায় করেন।

খাটের নিচে অন্যসব দিনের মতো হারিকেন জ্বলছে। আলোয় সাপ আসে না— এই কথা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে হারিকেনের কাছেই সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে গুয়ে আছে। মাওলানা হাততালি দিয়ে বললেন, অ্যাঁই যা। যা!

সাপটা মাথা তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ মাওলানাকে দেখে আবার মাথা নামিয়ে গুয়ে পড়ল। জুলেখা বলল, সাপ খেদানির কোনো দোয়া জানেন না? দোয়া পড়েন।

মাওলানা বললেন, খোদার কালাম নিয়া ঠাট্টা-তামাশা করবা না।

জুলেখা বলল, অন্য ব্যবস্থা নেন। লাঠি দিয়া মারেন।



মাওলানা বললেন, না। সে আমার কোনো ক্ষতি করে নাই। আমি তারে মারব কী জন্যে ?

যখন ক্ষতি করব তখন কিছু আর উপায় থাকব না। এইটা শঙ্খচূড় সাপ। এর বিষ নামানি কোনো ওঝার পক্ষেও সম্ভব না।

মাওলানা সাপ খেদানোর চেষ্টা আরেকবার করলেন। শলার ঝাড়ু দিয়ে কয়েকবার সাপের খুব কাছাকাছি বাড়ি দিলেন। সাপের কোনো ভাবান্তর হলো না। মাথা উঁচু করে সে একবার মাওলানাকে দেখল, আরেকবার জুলেখাকে দেখে আগের মতো মাথা নামিয়ে ফেলল। মাওলানা বা জুলেখা দু'জনের কেউ তখন জানে না এই শঙ্খচূড় সাপটা ডিম পাড়ার জন্যে খাটের নিচটা বেছে নিয়েছে। তাকে এখান থেকে সরানো এখন অসম্ভব।

ধনু শেখ খেতে বসেছেন। খাটে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার সাজানো হয়েছে। লাবুস তাঁর সঙ্গেই বসেছে। কালিজিরা চালের পোলাও, খাসির মাংস। বাটিভর্তি পঁয়াজ দেয়া হয়েছে। খাদিমদার আছে দু'জন। একজন লাবুসের প্লেটে খাবার দিচ্ছে, আরেকজন ধনু শেখকে দেখছে।

লাবুস মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। তার গায়ে নকশাতোলা পাঞ্জাবি। পায়জামা পাঞ্জাবিতে লাবুসকে সত্যিকার অর্থেই রাজপুত্রের মতো লাগছে। ধনু শেখ খানিকটা বিচলিত বোধ করছেন। কেন করছেন তাও বুঝতে পারছেন না। তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, তোমার নাম কী বলেছিল। বিশ্বরণ হয়েছে। আরেকবার বলো।

লাবুস।

পঁয়াজ নিয়া খাও। মুসলমানদের জন্যে পঁয়াজ খাওয়া দুস্তর। কারণ পঁয়াজ মুসলমান। রসুন হিন্দু। বুঝেছ ?

হঁ।

একবার তো বলেছি হঁ হাঁ করবা না। এখন তোমাকে আদবকায়দা শিখতে হবে। কারণ তুমি এখন রইস আদমি।

লাবুস বলল, রইস আদমির দোষ-ত্রুটি লাগে না। দোষ-ত্রুটি গরিবের জন্য।

তোমাকে এইসব কে শিখিয়েছে ? তোমার ভিক্ষুক পিতা ?

আমার যা শিখার আমি নিজে শিখেছি। আমার কোনো শিক্ষক নাই।

ধনু শেখ বললেন, আমারে শিক্ষক মানতে পার। আমি অনেক কিছু জানি যা তুমি জানো না। সোহরাবদীর নাম শুনেছ ?

জি-না।

তিনি এখন আমাদের নেতা। আমি তাঁর নাম দিয়েছি কাটাকুটি নেতা।

কেন?

কারণ তিনি গোপনে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা বলেন। তাঁর মন্ত্র হিন্দু কমাও।

মুসলমান কমাও, এই মন্ত্র কি কেউ বলে?

সব হিন্দু নেতাই মনে মনে এই মন্ত্র জপ করে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে বলে।

গান্ধিজি কি বলেন?

গান্ধিজি চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে গান্ধিপোকার মতো ‘পাদ’ দেন।  
তখন সব জ্বলেপুড়ে যায়। হা হা হা।

লাবুস খাওয়া বন্ধ করে ধনু শেখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁর হাসি  
অবিকল শশাংক পালের হাসি। মানুষটা চলে গেছে, কিন্তু তার হাসি রেখে  
গেছে।

ধনু শেখ বললেন, হিন্দু মারতে হবে এটা মাথার মধ্যে রাখবা। হিন্দু না  
মারলে পাকিস্তান কায়েম হবে না। হিন্দু মারলে ইংরেজ সরকার তোমাকে কিছুই  
বলবে না। কী জন্যে কিছু বলবে না জানো?

জানি না।

ইংরেজ চায় আমরা নিজেরা মারামারি করি। আমরা মারামারি করলে তারা  
থাকবে নিরাপদ। তখন ক্ষুদীরামরা তাদের মারবে না। এখন বুঝেছ যে শিক্ষক  
হওয়ার যোগ্যতা আমার আছে? কী হলো, খাওয়া শেষ?

জি জনাব খাওয়া শেষ।

লাবুস হাত না ধুয়েই উঠানে নেমে গেল। রুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টিতেই  
হাত ধোয়া হয়ে যাবে। লাবুস ভিজতে ভিজতে হরিচরণের বাড়ির দিকে যাচ্ছে।  
পাকা পুলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। খালে পানি বেড়েছে, শোঁ শোঁ শব্দ  
হচ্ছে। শুনতে ভালো লাগছে। শব্দের মধ্যেও ভালো মন্দ আছে। কিছু শব্দ শুনতে  
ভালো লাগে, কিছু শব্দ শুনতে খারাপ লাগে। এর কারণ কী? আল্লাহপাক  
মানুষকে যেমন ভালো এবং মন্দতে ভাগ করছেন— জগতের সবকিছুকেই তাই  
করছেন? এ তাঁর কেমন লীলা?





বৈশাখের শুরু। ভোরের আলো ভালোমতো ফোটে নি। আকাশ মেঘলা বলে চারদিক অন্ধকার হয়ে আছে। আকাশের মেঘ কিছুটা মনে হয় নিচেও নেমে এসেছে। জায়গায় জায়গায় গাঢ় কুয়াশা। বৈশাখ মাসের সকালে কুয়াশা পড়ে না। আজ পড়েছে।

হরিচরণের কবর এবং তার চারপাশ কুয়াশার মধ্যে পড়েছে। দূর থেকে আবছাভাবে বাঁধানো কবর এবং কবরের পাশের আমগাছটা চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে কেউ একজন কবরের ওপর মস্ত ছাতা মেলে ধরে আছে।

কবরের ঠিক মাথার কাছে আমগাছ কেউ লাগায় নি। আপনাআপনি হয়েছে। এবং অতি দ্রুত বিশাল বৃক্ষের রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর এই গাছে মুকুল আসে না। দু'বছর পর পর আসে। এই বছর ঝাঁকিয়ে মুকুল এসেছে। গাছের ডালভর্তি সুতা। সবার ধারণা কোনো কিছুর জন্যে আমগাছে সুতা বেঁধে প্রার্থনা করলে তা মিলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে নিজের মাথার চুল বাঁধতে হয়।

আমগাছের কাণ্ডে হাত রেখে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে তার নাম শিবশংকর। কোলকাতায় জাপানিরা বোমা ফেলবে এমন এক গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর শিবশংকরের বাবা মনিশংকর ছেলেকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আতঙ্কে বাস করার কোনো মানে হয় না। শিবশংকরকে নিয়ে এমনিতেই তিনি আতঙ্কে থাকেন। তার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো যাচ্ছে না। অসুখবিসুখ লেগেই থাকছে। শিবশংকরের সঙ্গে তিনি গোপীনাথ বল্লভ নামের একজনকে পাঠিয়েছেন। গোপীনাথ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। যোগ ব্যায়াম ভালো জানেন। যোগ ব্যায়ামের ওপর তাঁর একটা বই আছে। বইয়ের নাম— ‘যোগ ব্যায়াম, নিরোগ শরীর’।

গোপীনাথ বল্লভের দায়িত্ব শিবশংকরের স্বাস্থ্য ঠিক করে দেয়া। এই কাজটা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন। তাঁর নির্দেশেই সূর্য ওঠার আগে শিবশংকরকে উঠতে হয়। খালিপায়ে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর একঘণ্টা হাঁটতে হয়। হাঁটার পর পাঁচ মিনিট বজ্রাসন এবং পাঁচ মিনিট শবাসন করতে হয়। আসনের পর

ভরপেট পানি খেয়ে গলায় আঙুল দিয়ে সেই পানি বমি করে উগরে ফেলতে হয়। এই পদ্ধতির নাম পাকস্থলী ধৌতকরণ।

ধৌতকরণ শেষ হবার পর এক কাপ চিরতার পানি এবং মধু দিয়ে মাথিয়ে এক কোয়া রসুন খেতে হয়। রসুন খাবার পর আবার পাঁচ মিনিটের জন্যে শবাসন।

জটিল নিয়মকানুন। শিবশংকর প্রতিটি নিয়ম নিখুঁতভাবে পালন করে। তার প্রকৃতিটাই এমন যে, সে যা করে নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করে। যেন তাকে গণিতের একটা সূত্র দেয়া হয়েছে। তাকে থাকতে হবে সূত্রের ভেতরে। তবে পায়ে শিশির মাখানোর একটা পর্যায়ে সে হরিচরণের কবরের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রণামের ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আমগাছটার চারদিকে চক্র দেয়। এই চক্র দেয়ার মধ্যেও সে অংক নিয়ে এসেছে। ফিবোনাচ্চি রাশিমালায় চক্র। প্রথম দিনে এক চক্র, দ্বিতীয় দিনে এক চক্র। তৃতীয় দিনে ২ বার, চতুর্থ দিনে ৩ বার।

ফিবোনাচ্চি রাশিমালা হলো, ১ ১ ২ ৩ ৫ ৮ ১৩ ২১ ...। এই রাশিমালায় যে-কোনো সংখ্যা আগের দু'টি সংখ্যার যোগফল। শিবশংকর আজ ১৩ সংখ্যায় পড়েছে। আমগাছ ঘিরে সে চক্র দিচ্ছে। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখলেন মাওলানা ইদরিস। তিনি কাছে এসে অবাক হয়ে বললেন, কে?

শিবশংকর জবাব দিল না। যন্ত্রের মতো ঘুরতে লাগল। তের প্রদক্ষিণ শেষ করে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমার নাম শিবশংকর।

তুমি মনিশংকর বাবুর ছেলে? কেমন আছ বাবা?

ভালো আছি।

গাছের চারদিকে ঘুরছ কেন?

এম্মি। কাকু, আপনি ভালো আছেন?

ভালো আছি বাবা। আমাকে চিনেছ?

কেন চিনব না! এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলেন?

নদীর ঘাটে গিয়েছিলাম। এম্মি গিয়েছিলাম, কোনো কাজে না।

শিবশংকর অস্পষ্ট গলায় প্রায় বিড়বিড় করে বলল, প্রতিটি মানুষের কাজকর্মের ত্রিশভাগ অর্থহীন।

মাওলানা বললেন, কথাটা ভালো বলেছ তো। তবে কিছু মানুষের জন্যে এটা ঠিক না। হরিচরণ বাবু জীবনে কখনো অর্থহীন কাজ করেন নি।



শিবশংকর বলল, আপনি তো তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেন নি। কাছ থেকে দেখলে হয়তোবা জানতেন তাঁর জীবনের ত্রিশভাগ কাজ অর্থহীন।

তুমি পড়াশোনা কী করছ ?

কলেজে ভর্তি হয়েছি।

মেট্রিকে তো খুব ভালো করেছিলে। স্বর্ণপদক পেয়েছিলে। মনিশংকর বাবু এই উপলক্ষে সবাইকে খানা দিলেন। তোমারও আসার কথা ছিল।

হঠাৎ শরীর খুব খারাপ করল, আসতে পরলাম না। আমার শরীর ভালো না। প্রায়ই অসুখবিসুখ হয়।

হরিচরণ বেঁচে থাকলে তোমার কারণে আনন্দ পেতেন। তিনি যে তোমার অসুখ ভালো করেছিলেন, এটা কি তোমার মনে আছে ?

শিবশংকর নিচু গলায় বলল, মনে আছে। তবে তিনি আমার অসুখ সারান নি, এই ক্ষমতা মানুষের নাই। আমি ভালো হয়েছি আপনাপনি। মানুষের শরীরে নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাই কাজ করেছে।

মাওলানা বললেন, বাবা যাই ?

শিবশংকর দুই হাত জোড় করে মাথা খানিকটা নিচু করে বলল, নমস্কার।

হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি এই আদব দেখায় না। মুসলমানরাও দেখায় না। বিধর্মী কাউকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে না। তিনি নিজে বলতে কোনো বাধা দেখেন না। ‘আসসালামু আলাইকুম’-এর অর্থ— তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাড়ছে। কেন বাড়ছে তিনি জানেন না। উড়া উড়া শোনা যাচ্ছে— মুসলমানদের জন্যে আলাদা দেশ হবে, হিন্দুদের জন্যে আলাদা দেশ। মুসলমানের দেশে কোনো হিন্দু থাকতে পারবে না। মন্দির থাকতে পারবে না। সব মন্দির গুঁড় করে মসজিদ বানানো হবে। হিন্দু দেশেও একই ব্যবস্থা। তবে তাদের ব্যবস্থা আরেকটু জটিল। হিন্দুরাজ্যে ভাগ ভাগ থাকবে— এক ভাগে ব্রাহ্মণ, আরেক ভাগে ক্ষত্রিয় ...। শুধু অস্পৃশ্যদের জন্যে আলাদা দেশ হবে। অস্পৃশ্যরা সেই দেশে থাকবে। সেই দেশের নামও না-কি ঠিক হয়েছে ‘হরিজন দেশ’। নামটা দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধি। তিনি হবেন হরিজন দেশের রাজা।

গত কয়েকদিন ধরে জুম্মাঘরের টিনের ছাদে একটা শকুন বসছে। এটা ভালো লক্ষণ না। অতি অশুভ লক্ষণ। কে জানে বান্ধবপুর হয়তো হিন্দুরাজ্যে পড়বে। তারা মসজিদটাকে মন্দির বানিয়ে ফেলবে। সন্ধ্যাবেলায় মসজিদ থেকে আজানের শব্দ আসবে না। কাঁসার ঘণ্টার শব্দ আসবে।



মাওলানা ইদরিস অবেলায় খেতে বসেছেন। চারটা প্রায় বাজে। আসরের নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। আসরের আজান পড়ে গেলে আর খাওয়া যাবে না। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ। এই সময়ে কেয়ামত হবে বলেই খাওয়া-খাদ্যে মন না দিয়ে শেষ বিচারের কথা ভেবে বিষণ্ণ থাকার বিধান আছে। সেই সময় সূর্য নেমে আসবে মাথার এক হাতের মধ্যে। শরীর থেকে ঝরনার মতো ঘাম বের হবে। মানুষ নিজের ঘামের সমুদ্রে ডুবে যাবে। 'ইয়া নফসি! ইয়া নফসি!' বলার ফুরসতও পাবে না।

আজ খানা খেতে এত দেরি হবার কারণ খাওয়া জোগাড় হয় নি। এখন যে জোগাড় হয়েছে তাও বলা যাবে না। কুরানি দিয়ে নারকেল কুরিয়ে এক প্লেট নারকেল এবং লবণ মাখানো দু'টা শসা নিয়ে মাওলানা বসে আছেন। পাশে এক গ্লাস পানি। আলাদা একটা পিরিচে সামান্য লবণ এবং এক টুকরা কাগজি লেবু। লেবু থেকে সুন্দর গন্ধ আসছে। তিনি নিয়মমাফিক প্রথমেই চোখ বন্ধ করে আল্লাহপাককে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বললেন, 'হে গাফুরুর রহিম! তুমি যে তোমার বান্দাকে ভুলে যাও নাই এতেই আমি খুশি। তুমি বান্দার রিজিকের ব্যবস্থা করেছ, এই জন্যে বান্দার আনন্দের সীমা নাই।'

মাওলানা বিসমিল্লাহ বলে লবণ জিভে ছোঁয়ালেন। নবী-এ-করিম (দঃ) জিভে লবণ ছুঁইয়ে খাওয়া শুরু করতেন। প্রতিটি বিষয়ে নবীকে অনুসরণ করা সব মুসলমানের কর্তব্য। তাঁর খাবার সময় জুলেখা সামনে থাকে। আজ জুলেখা নেই। সে পাশের ঘরে কী যেন করছে— খুটখাট শব্দ আসছে। মাওলানা ডাকলেন, জুলেখা!

জুলেখা সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখ কঠিন। একটু আগে সে যে কেঁদেছে, এটা বোঝা যায়। গালের পানির দাগ শুকিয়ে আছে। মাওলানা বললেন, অতি তৃপ্তি সহকারে খানা খাচ্ছি।

জুলেখা বলল, আপনার মুখে রুচি বেশি— যাই দিব তাই তৃপ্তি নিয়া খাবেন। আমপাতা সিদ্ধ করে দিলে আমপাতা খেয়েও বলবেন, গুরুর আলহামদুলিল্লাহ।

মাওলানা বললেন, আজকের খাওয়া নিয়া তুমি মনঃকষ্টে আছ, এইটা বুঝতে পারতেছি। মনঃকষ্টে থাকবা না— আল্লাহপাক নারাজ হবেন।

নারাজ হবেন কেন?

কারণ তিনি রিজিকের মালিক। তাঁর ঠিক করে দেয়া রিজিক দেখে মন খারাপ করলে তিনি নারাজ হবেন না?



জুলেখা তীব্র গলায় বলল, নারাজ হলে হবেন। আমি মনে কষ্ট নিয়া থাকব।

মাওলানা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তুমি যে মনঃকষ্টে থাকবা এইটাও কিন্তু তার বিধান। তিনি সূরা বনি ইস্রাইলে বলেছেন, 'আমি তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় হারের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে সম্ভব।' তুমি যে মনে কষ্ট পেয়েছ, এইটাও তোমার গলার হারে লেখা ছিল বলেই পেয়েছ।

জুলেখা বলল, আমি যদি আজ সন্ধ্যায় আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, সেটাও কি গলার হারে লেখা?

মাওলানা বললেন, তুমি কোথায় যাবে?

আমি আগে যে প্রশ্ন করেছি তার জবাব দেন।

মাওলানা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি যা করবে সবই তোমার ভাগ্যে লেখা।

জুলেখা বলল, আমি আপনারে ফালায়া চইলা গেলে আপনি রাগ করতে পারবেন না। এইটা আমার ভাগ্যে লেখা ছিল।

মাওলানা শস্য কামড় দিলেন। জুলেখা তাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। সে যে চলে যাবার কথা বলছে— এটা কতটুকু সত্যি তাও বুঝতে পারছেন না। পোয়াতি অবস্থায় অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক চিন্তা মাথায় আসে। বিচিত্র সব কাজ করতে ইচ্ছা করে। জুলেখার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ব্যাপারটা এরকম কিছুই হবে। সে যাবে কোথায়? তার যাবার জায়গা কই?

জুলেখা বলল, বেশ কিছু দিন ধরে আমি ঠিকমতো খাওয়া-খাদ্য করতে পারতেছি না। কারণ ঘরে খাওয়া নাই। পেটের সন্তানটার জন্যে আমার ভালো খানা দরকার। এই সন্তান আমার অনেক কষ্টের। এর অযত্ন হইতে আমি দিব না। সেই জন্যেই আপনারে ছেড়ে যাব।

মাওলানা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কই যাবে? খাওয়া-খাদ্য কে তোমারে দিবে?

জুলেখা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আল্লাহপাক দিবেন, তবে অন্যের মাধ্যমে দিবেন।

অন্যটা কে?

সেটা আপনার জানার প্রয়োজন নাই।

মাওলানার মুখে খাওয়া এখন রুচছে না। খাওয়া ফেলে উঠে পড়তেও পারছেন না। এতে রিজিকের অসম্মান হয়। আল্লাহপাক রিজিকের অসম্মান পছন্দ করেন না। রিজিকের অসম্মান এক অর্থে তাঁরই অসম্মান।

জুলেখা বলল, একটা সোনার নাকফুল আর আটটা রুপার চুড়ি বিছানার উপর রেখেছি। খাওয়া শেষ করে এগুলি নিয়া বাজারে যাবেন। বিক্রি করে চাল, ডাল, তেল কিনবেন।

মাওলানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা। তিনি এখন নিশ্চিত হয়েছেন জুলেখা কোথাও যাবে না। তিনি শশার ওপর কাগজি লেবুর রস দিলেন। শশায় কামড় দিলেন। কী স্বাদ! আল্লাহপাকের মহিমা। সামান্য শশায় তিনি বেহেশতি খানার স্বাদ দিয়েছেন।

বান্ধবপুর বাজারে বিরাট উত্তেজনা। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু পালিয়ে গেছেন। ইংরেজ সরকার তাকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। অসংখ্য গোরা পুলিশ বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটা মাছিরও যেখানে পালাবার উপায় নেই, সেখানে একজন জলজ্যান্ত মানুষ কীভাবে পালাবে? এই অসাধ্য নেতাজি সাধ্য করেছেন। পুলিশের এখন মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। গোলগাল চেহারার যাকেই পাচ্ছে তাকেই ধরছে। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাস করছে, 'তুম নেতাজি হ্যায়?'

মাওলানা ইদরিস অবাক হয়েই একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, নেতাজিটা কে? উনার পরিচয় কী?

যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে বিরক্ত হয়ে বলল, নেতাজিরে চিনেন না, আপনি থাকেন কই? জঙ্গলে?

মাওলানা বিব্রত বোধ করছেন। অনেককে তিনি চিনেন। জিন্নাহ সাবকে চিনেন, মহাত্মা গান্ধিকে চিনেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে চিনেন। নেতাজির নাম এই প্রথম শুনছেন। তিনি যে অতি ক্ষমতাধর ব্যক্তি এটাও বোঝা যাচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায় এককড়ির দোকানে খবরের কাগজ পাঠ হয়। প্রথমবারের মতো মাওলানা খবরের কাগজের পাঠ শোনার জন্যে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পত্রিকা পাঠক গৌরঙ্গ বললেন, আজকের কাগজের পুরা পাতা গরম খবরে ভর্তি। এত গরম যে, কাগজে হাত দিলেই হাতে ফোসকা পড়ে যাবে। গৌরঙ্গ কাগজের গরম কমানোর জন্যে ক্রমাগত কাগজে ফুঁ দিচ্ছেন। শ্রোতারা খুবই আমোদ পাচ্ছে। গৌরঙ্গ বললেন, কোনটা রেখে কোনটা পড়ি? যুদ্ধের খবরটা পরে পড়ব। গান্ধিজিরও গরম খবর আছে। উনি ডিগবাজি খেয়েছেন।

### গান্ধিজির ডিগবাজি

হিটলারের বোমারু বিমানের আক্রমণে লন্ডন নগরী



ধ্বংসস্থূপে পরিণত হওয়ায় গান্ধিজি মনক্ষুণ্ণ। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশদের ধ্বংস করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আমি চাই না।

শ্রোতাদের ভেতর থেকে বিস্ময়ের ধ্বনি উঠল। একজন বলল, গান্ধিজি ইংরেজের পয়সা খেয়েছেন। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

আরেক শ্রোতা বলল, সারাজীবন বলেছে রাম রাম, এখন বলে টে টে। যুদ্ধের খবর শুনি, গান্ধিজি গুইন্যা লাভ নাই। নেতাজি পালায়া কোথায় গেছেন এই বিষয়ে কিছু আছে? এখন আমাদের ভরসা নেতাজি। গান্ধি দিয়া কাম হবে না। গুদ্রের পুলার গালে চুমা দিয়া স্বরাজ আনা যায় না।

গৌরঙ্গ বললেন, বড় খবর আছে। সবে শেয়ে পড়ব।

মাওলানা ইদরিস পুরো কাগজ শুনে বাড়ি ফিরে দেখলেন, জুলেখা ঘরে নেই। সন্ধ্যার পর পুকুর থেকে পানি আনার জন্যে আগে পুকুরে যেত। শরীর ভারী হবার পর যাওয়া বন্ধ করেছে। তারপরও মাওলানা পুকুর ঘাটে খোঁজ নিতে গেলেন। সেখানেও জুলেখাকে পাওয়া গেল না।

জুলেখা বাড়িঘর সুন্দর করে গুছিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে দু'টা আগরবাতির কাঠি জ্বালিয়েছে। কাঠি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু গন্ধ আছে। মন শান্ত করার জন্যে মাওলানা দরুদ পাঠ শুরু করলেন। একাগ্রচিত্তে দরুদ পড়লে অশান্ত মন শান্ত হয়। উন্মাদ রাগ গলে পানি হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। চাল ডাল তেল নুন এখন ঘরে আছে। ইচ্ছা করলেই খিচুড়ি বসাতে পারেন। তাঁর সেই ইচ্ছা করছে না। তিনি নৌকাঘাটায় গেলেন। জুলেখা নৌকা নিয়ে কোথাও গেলে ঘাটের মাঝিরা বলতে পারত। মাঝিরা কেউ কিছু বলতে পারল না।

লাবুস হরিচরণের বাড়িতে থাকতে শুরু করেছে। প্রথম দিন সে একাই ছিল, দ্বিতীয় দিনে একজনকে চাকরি দেয়া হলো। সে মহা উৎসাহে কাজে লেগেছে। তার নাম হাদিস উদ্দিন, মধ্যবয়স্ক ছোটখাটো মানুষ। পোলিওর কারণে একটা পা অশক্ত। সে চলে লেংচাতে লেংচাতে। বাজারে তাকে ডাকা হতো ব্যাঙউদ্দিন। কারণ সে নাকি ব্যাঙের মতোই লাফিয়ে চলে। এই পর্যন্ত তার জীবন কেটেছে ওস্তাদ চোর দরবার মিয়ার সাগরেদি করে। বছরখানেক ধরে দরবার মিয়া নিখোঁজ বলে সে কর্মশূন্য। বাজারে এর-তার দোকানের বারান্দায় তার খেয়ে না-খেয়ে দিন কাটছিল। চোরের সাগরেদকে কেউ চাকরি দেয় না।

লাবুস দিয়েছে। সে কয়েকবারই লাবুসকে বলেছে, আর কাউকে লাগবে না। কাজ যা আছে আমি একাই পারব। আমার হাত দশটা। দুইটা দেখা যায়। বাকি আটটা দেখা যায় না।

হাদিস উদ্দিন লোকটি আসলেই কাজের। সে ঘরদুয়ার মোটামুটি গুছিয়ে ফেলেছে। উঠানে কোমর সমান ঘাস গজিয়েছিল। ঘাস কাটা হয়েছে। টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে পড়ে ছিল। সেতাবনগর থেকে টিউবওয়েলের কারিগর এনে কল সারিয়েছে। হাদিস উদ্দিন রান্নাবান্নাতেও দক্ষ। সে লাবুসকে প্রথমদিনই বলেছে, আপনে খাইতে বসবেন চটি জুতা হাতে নিয়া। খাইতে গিয়া যদি দেখেন লবণ হয় নাই, কোনো একটা পদ খারাপ হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে চটি জুতা দিয়া গালে বাড়ি দিবেন। ভালো হইলে কিছু বলার নাই, খারাপ হইলে চটি জুতা।

লাবুস পুকুরঘাটে বসে আছে। সে সন্ধ্যা থেকেই বসে আছে। এখন রাত আটটা। আকাশে পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের ছবি পড়েছে পুকুরে। সুন্দর লাগছে দেখতে। কোনো বাতাস নেই বলে পুকুরের পানি নড়াচড়া করছে না। লাবুস যেখানে বসেছে, সেখান থেকে আকাশের চাঁদ এবং পুকুরের চাঁদ দুটাকেই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত লাগছে। আশেপাশে কোথাও কেয়া ফুল ফুটেছে। তার তীব্র সুবাসও নাকে এসে লাগছে।

হাদিস উদ্দিন লাবুসের পাশে ফর্সি হক্কা রাখতে রাখতে বলল, ছোটকর্তা, তামুক খান।

লাবুস বলল, আমি তামাক খাই না।

হাদিস উদ্দিনের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। সিন্দুক ঘাঁটতে গিয়ে হক্কার সন্ধান সে আজ সকালেই পেয়েছে। সারা দুপুর তেঁতুল দিয়ে ঘষে ঘষে রূপার হক্কা ঝকঝকে করা হয়েছে। এক ফাঁকে তামাক টিক্কা আনতে তাকে বাজারে যেতে হয়েছে। সবচে' ভালো তামাকই এনেছে। মেশকে আশুরী। তার ওস্তাদ দরবার মিয়া এই তামাক খুব পছন্দ করতেন।

হাদিস বলল, হক্কা নিয়া যাব ? না-কি একটা টান দিয়া দেখবেন ঘটনা কী ? ভালো লাগতেও পারে।

টান দিব না।

খানা কখন খাবেন ছোটকর্তা ?

দেরি আছে। আরেকটা কথা, তুমি আমাকে ছোটকর্তা ডাক কেন ? বড়কর্তাটা কে ?



হাদিস বলল, আপনিই বড়কর্তা। বয়স কম বলে ছোটকর্তা বলি। আপনি নিষেধ করলে আর ছোটকর্তা বলব না।

নিষেধ করছি না। তোমার যা ইচ্ছা ডাকবে।

হাদিস ছোট্ট একটা মিথ্যা কিছুক্ষণ আগে বলেছে। সচরাচর মিথ্যা কথা সে বলে না। তার কাছে বড়কর্তা দরবার মিয়া। আর কাউকে বড়কর্তা ডাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

হাদিস ইতস্তত করে বলল, দুইটা মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলব ?  
বলো।

এই বাড়িতে যে একটা গুপ্তঘর আছে আপনি জানেন ?

লাবুস বলল, জানি। হরিকাকু আমাকে দেখিয়েছিলেন। কোলে করে গুপ্তঘরে ঢুকেছেন। সিন্দুকের ভিতর দিয়ে গুপ্তঘরে যেতে হয়। তুমি সন্ধান কীভাবে পেয়েছ ? সন্ধান পাওয়ার তো কথা না।

হাদিস আগ্রহের সঙ্গে বলল, সিন্দুকে কী আছে দেখতে গেছি, জিনিসপত্র নামাইতেছি— হঠাৎ দেখি সিন্দুকের নিচের তক্তার এক কোণায় একটা আংটা। আংটা টান দিতেই সিন্দুকের তালা খুলে গেল— দেখলাম এক সুরঙ্গ।

সুরঙ্গের ভিতরে ঢুকেছিলা ?

না।

ঢুক নাই কেন ?

আপনারে নিয়া ঢুকব, এইজন্যে ঢুকি নাই।

ও আচ্ছা। এখন তুমি যাও।

রাতে কি সুরঙ্গে ঢুকবেন ? ঢুকলে মশাল জ্বলাই। সাপখোপ থাকতে পারে।

রাতে ঢুকব না।

আগামীকাল দিনে কি ঢুকবেন ?

আগামীকালেরটা আগামীকাল চিন্তা করব। আর শোন, আজ রাতে আমি খাব না।

ক্ষুধা হয় নাই ?

ক্ষুধা হয়েছে, কিন্তু খাব না। উপাস দিব।

হাদিস বিস্মিত হয়ে বলল, কেন খামুকা উপাস দিবেন ?

লাবুস বলল, একসময় খাওয়া ছিল না, উপাস দিছি। এখন খাওয়া থাকা সত্ত্বেও উপাস দিব। দুই উপাসের মধ্যে পার্থক্য কী দেখব।

হাদিসের ভুরু কুঁচকে গেল। তার ক্ষীণ সন্দেহ হলো, ছোটকর্তার মাথায় ফর্টিনাইন আছে। মাথা ফর্টিনাইন লোকের সাথে কাজ করা মুশকিল। তারা চলে ঝাঁকের মাথায়। তার ওস্তাদ দরবার মিয়ার মাথার মধ্যেও ফর্টিনাইন ছিল। কোনো চোর পূর্ণিমার রাতে চুরিতে বের হয় না। তার ওস্তাদ বের হতেন। হাসি মুখে বলতেন, আন্ধাইরে চুরি করব কোন দুঃখে?

লাবুস হাদিস উদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার এখানে কাজ নেয়ার আগে তুমি তো অনেকদিন বাজারে ছিলে।

জি।

তোমার জানামতে বাজারে কেউ কি আছে যে প্রায়ই অভাবের কারণে না খেয়ে থাকে?

একজন আছে। রামায়ণ পাঠ করে— শ্রীনাথ। কাজকর্ম পায় না। পেরায়ই এক দুই বেলা না খায়া থাকে। কী জন্যে জানতে চান?

এম্মি। তুমি এখন যাও।

রাতে সত্যই খাবেন না?

না।

এইখানে কতক্ষণ বইসা থাকবেন?

বুঝতে পারছি না।

চাঁদ অনেক ওপরে উঠে গেছে। লাবুস একই সঙ্গে দু'টা চাঁদ এখন আর দেখতে পারছে না। কেয়া ফুলের গন্ধ এখনো আছে। গন্ধ তীব্র হয়েছে। লাবুসের মনে হলো, একসঙ্গে কয়েকশ কেয়া ফুল ফুটেছে।

ছোটকর্তা তাকে চলে যেতে বলেছেন। হাদিস চলে যায় নি। একটু দূরে শিমুলগাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে সে ওস্তাদ। বড়কর্তা দরবার মিয়া তাকে লুকিয়ে থাকার কৌশল শিখিয়েছেন। হাতেকলমে শিখিয়েছেন।

ল্যাংড়া, মন দিয়া শোন কী বলি। সাদা রঙ থাইকা একশ হাত দূরে থাকবি। সাদা রঙ দূর থাইকা দেখা যায়। সাদা রঙের কাপড় গেঞ্জি সব 'নট'। লুকায়া যখন থাকবি হাসবি না। হাসলে দাঁত বাইর হবে, দূর থাইকা দাঁত দেখা যাবে। বুঝছস?

বুঝছি।

চোখ কখনো পুরা খুলবি না। পিটপিট কইরা দেখবি। কী জন্যে বল দেখি? জানি না বড়কর্তা।



আরে গাধা, চোখে সাদা অংশ আছে। দূর থাইকা চোখের সাদাও দেখা যাবে। জন্তু জানোয়ারের দিকে নজর কইরা দেখবি। তারার চোখে কোনো সাদা অংশ নাই। কী জন্যে বল দেখি ?

জানি না বড়কর্তা।

এক জন্তু যেন আরেক জন্তুরে দূর থাইকা না দেখে এই জন্যে এমন ব্যবস্থা। দেখলে একজন আরেকজনের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়বে।

বাহ্।

গাছের আড়ালে যখন লুকাবি ঘাপটি মাইরা বইসা থাকবি না। দুই হাতে গাছ জড়িয়ে শরীর মিশিয়ে থাকবি। তোর সামনে দিয়া লোক যাবে তোরে দেখবে না। ভাববে গাছের গুড়ি।

হাদিস এখন অবশ্যি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে নেই। গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে। পুরনো দিনের কথা ভাবছে। বড়কর্তার সঙ্গে কী সুখের সময়ই না কেটেছে! সেইসব দিন কি আর আসবে? এই বাড়িতে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস। সুরঙ্গের ভেতরে কী আছে কে জানে। জিনিসপত্রের সব হিসাব সে চোখে চোখে রাখছে। বইয়ের কাপড় দিয়ে মোড়ানো এক পোয়া ওজনের একটা কৃষ্ণমূর্তি পেয়েছে। সে সরিয়ে ফেলেছে। তার ধারণা জিনিসটা সোনার। ওস্তাদ দরবার মিয়া থাকলে অন্ধকারেও মূর্তি হাতে নিয়ে বলতে পারতেন জিনিসটা সোনার না রূপার, নাকি তামার। সে বুঝতে পারছে না। বুঝতে হলে স্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে যেতে হবে। লোক জানাজানি হবে। কী দরকার, তাড়াহুড়োর কিছু নাই। ওস্তাদ দরবার মিয়া বলতেন— এক কদম ফেলে যে এক মিনিট চিন্তা করে দ্বিতীয় কদম ফেলবে সে-ই দুনিয়ার সবচে’ বড় দৌড়বিদ।

পুকুরে ধুপ করে শব্দ হলো। মাছে ঘাই দিল বলে মনে হয়। হাদিস গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ভয়ে এবং আতঙ্কে বসে গেল। ঘাটের সিঁড়িতে দু’জন মানুষ পাশাপাশি বসে আছে। দুইজন একই ব্যক্তি— ছোটকর্তা লাবুস। এতে কোনো ভুল নাই। হাদিস চোখ বন্ধ করে তিনবার বলল, ‘আল্লাহ্ শাফি! আল্লাহ্ কাফি’। জিন-ভূতের ব্যাপার হলে এখন চোখ মেললে কিছু দেখবে না। হাদিস চোখ মেলল। এখনো দুজনকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় দুজনেরই ছায়া পড়েছে ঘাটে। সেই ছায়াও দেখা যাচ্ছে। দু’জন যে একই দিকে তাকিয়ে আছে তাও না। একজন তাকিয়ে আছে পুকুরের দিকে, অন্যজন পাকাবাড়ির দিকে।

হাদিসের দমবন্ধের মতো হলো। বুকে ব্যথা শুরু হলো। সে দু'হাতে বুক চেপে ধরে নিজের অজান্তেই কাঁপা গলায় ডাকল, ছোটকর্তা! দু'জনই একসঙ্গে তাকাল তার দিকে। একজন মিলিয়ে গেল। অন্যজন রইল।

লাবুস বলল, কিছু বলবে?

হাদিস কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ঘরে চলেন ছোটকর্তা। কী কারণে জানি ভয় লাগতেছে।

লাবুস উঠে দাঁড়াল। ঘরের দিকে রওনা হলো। হাদিস এখনো গাছের আড়াল থেকে বের হতে পারছে না। তার হাত-পা জমে গেছে।

রাত অনেক হয়েছে। বান্ধবপুর জামে মসজিদের ইমাম করিম সাহেব তাঁর বাড়ির উঠানে কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটু দূরে মাটিতে যে বসে আছে তার আসল নাম মজনু। লোকে তাকে ডাকে মজু গুগু। যদিও কেউ তাকে কখনো গুগুমি করতে দেখে নি। মজু গুগু অতি বলশালী ব্যক্তি, বিশাল শরীর। সেই তুলনায় মাথা অস্বাভাবিক ছোট। চোখ বড় বড়। চোখের সাদা অংশ সবসময় লাল থাকে।

মজুর হাতে বিড়ি। সমীহ করে প্রতিবারই মাথা ঘুরিয়ে বিড়িতে টান দিচ্ছে। প্রতিবার বিড়িতে টান দেয়ার আগে খাঁকারি দিয়ে থুথু ফেলছে।

করিম মজু গুগুকে ধর্মকথা শোনাচ্ছে। মজু গুগুকে দেখে মনে হচ্ছে সে আগ্রহ নিয়ে ইমাম সাহেবের কথা শুনছে।

মজু!

জে বলেন।

সবচে' বড় সোয়াবের কাজ কী জানো? কাফের মারা। ধর তুমি নামাজ কালাম পড় না। রোজা রাখ না। জুম্মার নামাজে সামিল হও না। তারপরেও একজন কাফের তুমি ধ্বংস করলা। তোমার হাতে বেহেশতের দরজার চাবি চইলা আসল। সেই চাবি দিয়া তুমি নিজেই বেহেশতের দরজা খুলবা। সত্তুরজন হুর এবং ত্রিশজন গেলমান গেটের বাইরে সোনার সিংহাসন নিয়া তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তুমি ঢোকা মাত্র তারা গোলাপজলের পানি দিয়া তোমাকে গোসল করাবে। রেশমি কাপড় পরায়ে সিংহাসনে বসাবে। বাদ্যবাজনা করে নিয়ে যাবে। বুঝেছ?

হুঁ।



অন্য ধর্মের কাফেরের চেয়ে নিজ ধর্মে যদি কেউ কাফের থাকে সেই কাফের ধ্বংস করার সোয়াব দশগুণ বেশি। কারণ একটাই— অন্য ধর্মের কাফের ইসলামের যে ক্ষতি করবে, ইসলাম ধর্মের ভেতরে থাকা কাফের তার চেয়ে দশগুণ বেশি ক্ষতি করবে।

মজু গুগা এক দলা থুথু ফেলে বলল, কারে খুন করতে হবে বলেন। এত প্যাচাল পাড়ার দরকার নাই। নগদ একশ' টেকা দিবেন। কার্য সমাধা করে দিব। কাকপক্ষীও জানবে না। কার্য সমাধা হওয়ার পরে আমি দুইমাস বাইরে থাকি। এই দুই মাসের খরচ আলাদা।

করিম অবাক হয়ে বললেন, মানুষ খুন করার কথা আসল কী জন্যে? আমি তোমাকে পাপ-পুণ্যের বিষয়ে কথা বলতেছি।

মজু উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল, যাই। টাকার জোগাড় যদি হয় খবর দিয়েন।

মজু রওনা দিয়েছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। করিম হতাশ গলায় বললেন, একশ' পারব না। এত টাকা আমার নাই। পঞ্চাশে কি সম্ভব? না।

ধর পঞ্চাশ এখন দিলাম। তুমি কার্য সমাধা করলা। তারপরে ধীরে সুস্থে যখন যা পারি তা দিয়া একশ' পুরা করলাম।

মজু আবারো থুথু ফেলে মুখ মুছতে মুছতে বলল, পুরা টেকা জোগাড় কইরা খবর দিবেন। দুই মাসের রাহাখরচ আলাদা। খুন হবে নগদ। টেকাও দিবেন নগদ।

করিম উঠানে বসে আছেন। মজু গুগার দেখাদেখি তার মুখেও ক্রমাগত থুথু জমেছে। হারামজাদা লাবুসটাকে শাস্তি না দিয়ে তিনি বেহেশতে গেলেও শাস্তি পাবেন না। এই হারামজাদার কারণে তাঁকে ন্যাংটা হয়ে দৌড়াতে হয়েছে। শুরুতে ভেবেছিলেন ঘটনা কেউ দেখে নি। ঘাটের দুই একজন মাঝি যে দেখেছে এই বিষয়ে তিনি এখন নিশ্চিত। লোকজন আড়ালে তাকে 'ন্যাংটা মাওলানা' ডাকে। এই অপমান সহ্য করার মানুষ তিনি না। করিমের মুখে আবার থুথু জমেছে। তিনি ঠিক মজু গুগার মতোই থুথু ফেললেন। মানুষ অনুকরণ প্রিয়।

শরিফা ঘরের ভেতর থেকে ডাকল, ভিতরে আসেন। ঘুমাইবেন না?

করিম বিরক্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না। শরিফা এগিয়ে গেল।

করিম বললেন, তোমারে তখন ঘর থাইকা বাইর হইতে নিষেধ করছি না?

শরিফা বলল, উঠানে কেউ নাই, আপনি একা। একটা কথা জিজ্ঞাস করব ?  
কর।

কিছুদিন যাবৎ দেখতাই আপনি পেরেশান। কী হইছে ?

করিম ইতস্তত করে বললেন, জিন খোররম বড় ত্যক্ত করিতেছে। তার কারণে পেরেশান।

আবার দেখা পাইছেন ?

হুঁ।

ভালো কোনো মাওলানার কাছ থাইকা তাবিজ আইনা পরেন।

আমার চেয়ে বড় মাওলানা এই অঞ্চলে কে আছে ?

শরিফা বলল, নিজের তাবিজ সবসময় নিজের জন্য কাজ করে না। মাওলানা ইদরিসের কাছ থাইকা তাবিজ নেন। শুনেছি তিনি সুফি মানুষ।

করিম বিরক্ত গলায় বলল, শোনা কথায় কান দিবা না। ইদরিস বিরাট বদ। এক নষ্টামাগিরে নিয়া কিছুদিন সংসার করছে। সেই মাগি পেট বাধায়া এখন আছে নটিবাড়িতে। সন্তান খালাস কইরা আবার পুরান ব্যবসা শুরু করব।

আপনারে কে বলছে ?

কেউ বলে নাই, আমি জানি।

শরিফা বলল, কেউ না বললে আপনি কেমনে জানবেন ? আপনি কি গেছিলেন নটিবাড়িতে ?

করিম স্ত্রীর স্পর্ধা দেখে অবাক হলেন। তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি শরিফা এই ধরনের কথা বলতে পারে। তার রাগ চরমে উঠে গেলেও রাগ দ্রুত কমালেন। সহজ গলায় বললেন, তুমি বিরাট বেয়াদবি করেছ। যাই হোক, ক্ষমা করলাম। এমন বেয়াদবি আর করবা না। ভাত দাও।

মাওলানা খেতে বসেছেন। শরিফা সামনে বসে গরম ভাতে পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। আজকের আয়োজন ভালো। করিমের পছন্দের পাবদা মাছ। হাওরের লালমুখা বড় পাবদা। ঝোল ঝোল করে রান্না। শরিফা পাতের এক কোনায় আদা সরিষা বাটা দিয়া রেখেছে। তরকারির সাথে এই জিনিস মিশিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগছে। করিম বলল, তুমি রান্দা শিখেছ ভালো। এই বিষয়ে কোনো ভুল নাই। রান্দা কার কাছে শিখেছ ? শাশুড়ি আমাদের কাছে ?

শরিফা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আগ্রহের সাথে বলল, আচ্ছা জিন কি ভাত-মাছ খায় ? মিষ্টি খাইতে পছন্দ করে, এইটা আমি শুনেছি। ভাত-মাছ খায় ?

জানি না।



জিন খোররমের সাথে সাক্ষাৎ হইলে মনে কইরা জিজ্ঞাস কইরা জানবেন।  
করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি কি তারে দাওয়াত কইরা খাওয়াইবা ?  
খামাখা কথা বলো।

শরিফা চুপ করে গেল। তার খুব ইচ্ছা করছিল জিন খোররমের সাথে তার  
যে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই ঘটনাটা বলে। রূপবান এক যুবকের বেশ ধরে সে  
এসেছে। নিজের নাম সে খোররম বলে নাই। অন্য কী যেন বলেছে। এখন মনে  
নাই। তাকে সে মা বলেছে। পাটিতে বসে খানা খেয়েছে। এত বড় একটা ঘটনা  
কাউকে বলার উপায় নাই।

খাওয়া শেষ করে করিম পান মুখে দিলেন। শরিফা বলল, এত বড় পাবদা  
মাছ আমি কই পাইলাম জিজ্ঞাস করলেন না ?

করিম পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, তোমার ভাইজান  
পাঠাইছেন। হাওরের মাছ আর কে পাঠাবে!

ধরেছেন ঠিক। ভাইজান নিজেই এসেছিলেন। পাঁচ মিনিট বসেন নাই। লঞ্চ  
ধরতে দৌড় দিয়েছেন। উনি যাবেন কইলকাতা। ছবিঘরে ছবি দেখবেন।

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি তোমার ভাইরে বললা না ছবিঘরে ছবি  
দেখা বিরাট গুন্যের কাজ ?

বলি নাই। ভাইজান আমারে কিছু টাকা দিয়া গেছে। মাছের ব্যবসায় বিরাট  
লাভ করেছে এইজন্যে।

কত টাকা দিয়েছেন ? সত্য কথা বলবা, তোমার টাকা নিয়া আমি পালায়া  
যাব না।

একশ' টাকা।

করিম চমকে উঠলেন। সেই চমক শরিফার চোখে পড়ল না।

তোমার ভাইয়ের মন ভালো। একশ' টাকা ভইনরে দিয়েছে সহজ কথা না।  
তবে শহর বন্দরে গিয়া টাকা নষ্ট করা ঠিক না। অর্থ সঞ্চয়ের জিনিস, অপচয়ের  
জিনিস না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

শরিফা বলল, শয়তান আমার ভাইয়ের ভাই হইলে সম্পর্কে আমিও  
শয়তানের ভইন। আর আমারে বিবাহের কারণে আপনে শয়তানের দুলাভাই।  
হি হি হি।

করিম কঠিন গলায় বললেন, এইগুলা কেমন কথা ?

তামাশা করলাম।

স্বামী নিয়া তামাশা করবা না। স্বামী তামাশার বিষয় না।

স্বামী কিসের বিষয় ?

ভক্তি শ্রদ্ধার বিষয় । হিন্দু মেয়ের সবই খারাপ । একটা শুধু ভালো গুণ । তাদের পতিভক্তি । হিন্দু মেয়েরা দিন কীভাবে শুরু করে জানো ? স্বামীর পা ধোয়া পানি খাইয়া ।

শরিফা বলল, এখন থাইকা আমিও আপনার পা ধোয়া পানি খাব ।

তার প্রয়োজন নাই ।

অবশ্যই প্রয়োজন আছে । সকালবেলা এক বালতি পানি আইন্যা দিব । আপনে পা ডুবিয়ে দিবেন । সারাদিন আমি এই বালতির পানি খাব । দুপুরে এই পানি দিয়া গোসল করব ।

অনেক রঙ্গ তামাশা হইছে । এখন যাও, পান আন । পান খাব ।

স্ত্রীর উল্টাপাল্টা কথায় করিম যথেষ্টই বিরক্ত । তবে তিনি বিরক্তির প্রকাশ দেখালেন না । তাঁর মাথায় সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা ।

শ্রীনাথ লাবুসের অধীনে চাকরি নিয়েছেন । নায়েব সর্দার জাতীয় কাজ । আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা । খাজনার কাগজপত্র ঠিক রাখা । শ্রীনাথের জন্যে ঘর দেয়া হয়েছে । শ্রীনাথ শর্ত দিয়েছেন, তাঁর ঘরে কোনো মুসলমান ঢুকবে না । মুসলমানের রান্না কোনো খাবারও তিনি খাবেন না । স্বপাক আহারের ব্যবস্থা ।

লাবুস সব শর্ত মেনে নিয়েছে । শ্রীনাথ বললেন, আপনি আমাকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন । দিনের পর দিন উপবাস করতে হয়েছে । অনুকম্প থেকে আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন । আমি একদিন তার প্রতিদান দিব ।

লাবুস বলল, আচ্ছা ।

হাদিস উদ্দিন নামে যাকে আপনি চাকরি দিয়েছেন, তার বিষয়ে কি আপনি কিছু জানেন ?

না ।

সে বিরাট বড় চোর দরবার মিয়ার শিষ্য । হাদিস উদ্দিন নিজেও বিরাট চোর । তাকে আপনার বিদায় করা প্রয়োজন । আমার পরামর্শ এই মুহূর্তে তারে বিদায় করবেন ।

লাবুস বলল, হাদিস উদ্দিনের কারণে আমি আপনাকে চাকরি দিয়েছি । আপনার উপবাসের কষ্টের কথা সে-ই আমাকে বলেছিল ।

শ্রীনাথ বললেন, সে আমার উপকার করেছে । এখন আমি আপনার অধীনের কর্মচারী । আমি আপনার স্বার্থ দেখব । তারটা না ।



লাবুস বলল, আমার স্বার্থ দেখার প্রয়োজন নাই। আপনি থাকবেন আপনার মতো, সে থাকবে তার মতো। এই বিষয়ে আলোচনা এইখানেই শেষ।

আপনি কিন্তু বিপদ নিয়া বাস করতেন।

ঠিক আছে করলাম। এখন আপনি আমাকে হিড়ম্বা রাক্ষসের কাহিনীটা বলেন।

কী বলব ?

একদিন দূর থেকে আপনার গলায় রামায়ণ পাঠ শুনেছিলাম। বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। আপনার কণ্ঠস্বর মধুর।

শ্রীনাথ বললেন, হিন্দু ধর্মগ্রন্থের পাঠ শোনা অন্য ধর্মের মানুষদের জন্যে নিষিদ্ধ। যে পাঠ করবে তার পাপ হবে, যে শ্রবণ করবে তারও পাপ।

তাহলে থাক।

তবে মুখস্থ বিদ্যা থেকে পাঠ করায় দোষ নাই। গ্রন্থ সঙ্গে না থাকলে ঠিক আছে।

শ্রীনাথ পাঠ শুরু করলেন—

নিদ্রা যায় নিরুপমা      সুবদনী ঘনশ্যামা  
এ রামা      তোমার কেবা হয়।  
এ ঘোর দুর্গম বনে,      নিদ্রা যায় অচেতনে,  
নাহি জানো      রাক্ষস আলয়।।  
তিলেক নাহিক ভর,      যেন আপনার ঘর  
অতিশয় দেখি দুঃসাহস।  
এই বন অধিকারী,      পাপ আত্মা-দুরাচারী  
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস।।



প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে বলেই সে তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষকে নানান রহস্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠায়। সারাজীবন প্রতিটি মানুষ তার রহস্যের খেলা খেলে। প্রকৃতি দাড়িপাল্লায় মেপে সবাইকে সমান রহস্য দেন না। কাউকে বেশিমাত্রায় দেন, যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়া এই মেধাবী মানুষটির চেহারা রাজপুত্রের মতো। সম্মোহনী ক্ষমতার জন্যেই হয়তোবা গান্ধিজির চেয়েও উঁচুস্থানে আসীন। কংগ্রেসের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। প্রকাশ্যে এই কথা বহুবার বলেও যখন কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্যে ভোট দাঁড়ান, তিনি ভোটে জিতেন। গান্ধিজি অসহায় বোধ করেন। কারণ তাঁর সমর্থিত প্রার্থী সিতারামাইয়া বিশাল ব্যবধানে পরাজিত।

সুভাষচন্দ্র অতি রহস্যময় মানুষ হলেও তাঁর চিন্তাভাবনায় কখনো রহস্য ছিল না। তাঁর এককথা— ইংরেজ আপনা-আপনি ভারত ছেড়ে যাবে সেই চিঁজ না। গান্ধিজির সত্যগ্রহ কিংবা অনশনে তারা টলবে না। বিপ্লবীদের এদিক-ওদিক খুঁটখাট গুলিবোমাতেও কিছু হবে না। ভারতকে স্বাধীন করতে হলে সশস্ত্র বিপ্লবের ভেতর দিয়ে তা করতে হবে। অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র। সুভাষচন্দ্র বসু নিজেকে এবং জাতিকে দুর্বল ভাবতে অভ্যস্ত না।

কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে পৌঁছল। তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে নতুন রাজনৈতিক দল করলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক যোগ দিলেন তাঁর সাথে। শেরে বাংলাও চাচ্ছিলেন অখণ্ড ভারত। মুসলিম লীগের সঙ্গে এই কারণেই তাঁর বনছিল না।

সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ড ইংরেজ সরকারের মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তাদের মাথায় বিশ্বযুদ্ধের ঝামেলা, এই ঝামেলায় সুভাষচন্দ্র বসুর রণহুঙ্কার অসহ্য বোধ হবারই কথা। ইংরেজ তাঁকে গৃহবন্দি করল। তিনি পালিয়ে গেলেন (১৭ জানুয়ারি, সন ১৯৪১)। প্রথমে গেলেন আফগানিস্তান। সেখান থেকে ছদ্মবেশে রাশিয়া, রাশিয়া থেকে জার্মানি।



জার্মানির চ্যান্সেলর হিটলার এই বাঙালির কথাবার্তায় মুগ্ধ। কী তেজ! হিটলারের শত্রু ইংরেজ, এই যুবকের শত্রুও ইংরেজ। একে অবশ্যই সাহায্য করা যায়। সুভাষচন্দ্র বসু সাহসী এক প্রস্তাব করে বসলেন। যে সব ভারতীয় সৈনিক জার্মানদের হাতে বন্দি হয়েছে, তাদের নিয়ে তিনি এক সৈন্যদল গঠন করবেন। এবং এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত বিজয়ের উদ্দেশে রওনা হবেন।

হিটলার প্রস্তাবে রাজি হলেন। বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের মুক্তি দেয়া হলো। তারা হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিল।

এদিকে মালয়ে কাকতালীয় এক ঘটনা ঘটল। জাপানিদের তাড়া খেয়ে ব্রিটিশ বাহিনী দ্রুত পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করছে। তাদের নাস্তানাবুদ অবস্থা। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন মোহন সিং। হঠাৎ তাঁর মাথায় এলো ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পালিয়ে না গিয়ে জাপানি সেনাদের হাতে ধরা দেয়া। তাদের রাজি করিয়ে বন্দি ভারতীয়দের নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এই যুদ্ধ হবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ। জাপান রাজি হয়ে গেল। ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের তুলে দিল মোহন সিং-এর হাতে। মোহন সিং ৪৫,০০০ ভারতীয় সৈন্য নিয়ে গঠন করলেন আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী।

আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর এক সদস্য সিপাহি বৃন্দাবন পাল। তার বাড়ি বান্ধবপুরে। বৃন্দাবন পালের বাবা আনন্দ পাল জানতেন, ছেলে জাপানিদের হাতে বন্দি হয়েছে। হলুদ জাপানিরা ছেলেকে অমানুষিক যন্ত্রণা করছে। যুদ্ধক্ষেত্রে খাবারের অভাব হলে জাপানিরা না-কি প্রায়ই বন্দিদের মেয়ে তাদের কলিজাও খাচ্ছে। তিনি জাপানিদের ধ্বংস কামনা করে মন্দিরে জোড়া পাঠা বলি দিলেন। পটপরিবর্তনের খবর তিনি জানতেন না।

হলুদ জাপানিরা আমাদের বন্ধু হয়ে গেছে, নেতাজি জার্মান ইউ বোটে করে জাপানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। ঠিক হয়েছে জাপানের সেনাবাহিনী এবং মোহন সিং-এর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী একসঙ্গে বার্মা আক্রমণ করে বাংলা ভূখণ্ডের দিকে আসতে থাকবে।

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে। আজাদ হিন্দ বাহিনীও পিছিয়ে নেই। তারাও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে।

এদিকে খবর রটেছে জার্মানির বিজ্ঞানীরা ভয়াবহ এক বোমা বানানোর কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। বোমার নাম অ্যাটম বোমা। সামান্য অ্যাটমের ভেতর না-কি লুকিয়ে আছে দৈত্য। সেই দৈত্যকে বের করে আনার চেষ্টা।



আমেরিকানরা গুপ্তচরদের এই খবরে বিচলিত। সত্যি কি এমন কিছু ওরা ঘটাতে যাচ্ছে? জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা পদার্থবিদ্যার রথি-মহরথিদের আশ্রয় এখন আমেরিকা। অ্যাটম বোমার গবেষণায় তারা এগিয়ে আসতে পারেন, তবে তার জন্যে রাষ্ট্রের সাহায্য দরকার। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বুঝাতে হবে যে, অ্যাটম বোমার মতো মারণাস্ত্র প্রয়োজন। বুঝানোর দায়িত্ব নিলেন পদার্থবিদ্যার গুরুদেব আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি নিজে শুধু যে দায়িত্ব নিলেন তা-না, তিনি পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী মানুষদেরকে দিয়েও রুজভেন্টকে বোঝানোর চেষ্টা চালালেন। মহাশান্তির জন্যে প্রয়োজন মহাঅশান্তি অ্যাটম বোমা।

আইনস্টাইনের কারণেই হয়তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শান্তির প্রয়োজনে অ্যাটম বোমা বানানো উচিত বলে প্রেসিডেন্ট রুজভেন্টকে অনুরোধ করে চিঠি পাঠালেন। আমেরিকায় শুরু হলো দৈত্য বানানোর প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার নাম— ম্যানহাটন প্রজেক্ট।

ম্যানহাটন প্রজেক্টে অ্যাটম বোমা বানানো চলতে থাকুক, আমরা ম্যানহাটন থেকে ফিরে আসি বান্ধবপুরে। সেখানে কার্তিক মাস। দিন শুরু হচ্ছে ঘন কুয়াশায়। এই বৎসর কুয়াশার একটু বাড়াবাড়ি আছে। এক-এক দিন এমন কুয়াশা হয় যে, একহাত সামনের মানুষও দেখা যায় না। ভরদুপুরে আকাশের দিকে তাকালে যে সূর্য দেখা যায় তা চাঁদের মতো। কুয়াশা সেই সূর্যের তেজ কেড়ে নিয়েছে।

এমনই এক কুয়াশার মধ্যদুপুরে মাওলানা ইদরিস টিউব কল থেকে খাবার পানি নিয়ে ফিরছেন। বাড়ির উঠানে পা দিয়েই গুনলেন বিড়াল কাঁদছে। শোবার ঘরের ভেতর থেকে বিরামহীন বিড়ালের কান্না ভেসে আসছে— মিয়াঁউ মিয়াঁউ মিয়াঁউ। তাঁর বাড়ি কুকুর-বিড়ালশূন্য। তিনি কুকুর-বিড়াল খুবই অপছন্দ করেন। কুকুর অপছন্দ করেন, কারণ আমাদের নবী (দঃ) কুকুর অপছন্দ করতেন। এই যুক্তিতে বিড়াল তাঁর পছন্দ করার কথা। কারণ নবীজির পছন্দের প্রাণী বিড়াল। কিন্তু মাওলানা ইদরিস কুকুরের চেয়েও বেশি অপছন্দ করেন বিড়াল।

মাওলানা বিরক্ত মুখে কিছুক্ষণ উঠানে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ঢুকলেন। পলকহীন চোখে তাঁকে বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকতে হলো। বিছানার ঠিক মাঝখানে কাঁথা দিয়ে পুঁটলির মতো করে জড়ানো একটা শিশু। তার দু'পাশে দু'টা বালিশ। তার মাথার কাছে ফিডিং বোতলে এক বোতল দুধ। শিশু হাত-পা ছুড়ছে এবং কাঁদছে ওয়াঁউ ওয়াঁউ। কান্নার এই শব্দকেই মাওলানা বিড়ালের মিয়াঁউ মিয়াঁউ ভাবছিলেন।



ইদরিস গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, জুলেখা! জুলেখা! কেউ জবাব দিল না। তবে শিশুটি কান্না থামিয়ে দিল। মাওলানা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। পৃথিবী এবং বেহেস্ত দুই জায়গাতেই সবচে' সুন্দর বস্তু ফুল। ফুল যত সুন্দরই হোক সে হাসতে পারে না, কাঁদতে পারে না। মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজেকে বদলাতে পারে না। সেই অর্থে অবশ্যই মানবশিশু ফুলের চেয়ে সুন্দর। মাওলানা বললেন, এই! এই!

শিশুটি হাত নাড়ল। তার চোখ ঘন কালো এবং গরুর চোখের মতো বড়। চোখের মণিতে আলোছায়ার খেলা। মাওলানা বললেন, নাম কিগো?

শিশু এবার পা নাড়াল।

মাওলানা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ছেলে না মেয়ে? প্রশ্নটিতে শিশু সম্ভবত অপমানিত বোধ করল। সে কাঁদতে শুরু করল। তার গলার স্বর এবার আগের চেয়েও উঁচুতে।

তার কি ক্ষিধে লেগেছে? ফিডিং বোতল মুখে ধরলে কি খাবে? দুধ কি বিছানায় গুইয়েই মুখে ধরবেন? না-কি আগে তাকে কোলে নিয়ে মুখে ধরবেন? কচি শিশুরা মাছের মতো পিচ্ছিল হয় বলে তাঁর ধারণা। কোলে নিতে গেলে পিচ্ছিলে পড়ে যাবে না তো! তিনি তাঁর এই দীর্ঘজীবনে কখনো কোনো শিশু কোলে নিয়েছেন এরকম মনে করতে পারলেন না। আহা, বেচারী হাত-পা নেড়ে কী কান্নাই না কাঁদছে!

মাওলানা বিসমিল্লাহ বলে অনেক আয়োজন করে শিশু কোলে নিলেন। তার মুখের সামনে ফিডিং বোতল ধরামাত্রই তার কান্না থামলো। সে চুকচুক করে দুধ টানছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়ছে না-কি? সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে দুধ খাওয়ানো কি বন্ধ করে দেবেন? সেটাই তো যুক্তিযুক্ত। ঘুমের মধ্যে কেউ খাদ্য গ্রহণ করে না। মানবসন্তান কেন করবে?

পবিত্র কোরান পাঠ করার সময় মাওলানা যেভাবে দোলেন এখনো তিনি মনের অজান্তে সেভাবেই দুলছেন। শিশুটির দিকে তাকিয়ে মিল দিয়ে দিয়ে বিচিত্র সব কথা বলে যাচ্ছেন—

এই বাবু!  
দুধ খাবু?  
মজা পাবু?  
কই যাবু?  
এই বাবু!  
তুমি হাবু।  
এবং হাবা  
মজা পাবা

কই যাবা ?  
বনে যাবা ?  
বনে বাঘ ।  
ও আল্লা  
বাবুর কী রাগ!

মাওলানার কথাবার্তা মনে হয় শিশুটির পছন্দ হচ্ছে । দুধ খেতে খেতেই সে হাসল । মাওলানা অস্পষ্ট গলায় বললেন, আহারে ! আহারে !! মাওলানার চোখ অশ্রুসিক্ত হলো । তিনি গভীর আবেগে বললেন, হে রাক্বুল আলামিন, হে গাফুরুর রাহিম! তোমার প্রতি নাদান বান্দা ইদরিসের সালাম ।

সন্ধ্যার মধ্যে অনেকেই জেনে গেল জুলেখা তার কন্যাসন্তানকে মাওলানার বাড়িতে ফেলে চলে গেছে । মাওলানা মহাবিপদে পড়েছেন । মাওলানা নিজে থাকেন একবেলা খেয়ে । সেই খাওয়াও সবদিন জোটে না । বাচ্চাটাকে খাওয়াবেন কী ?

কয়েকজন আগ্রহ করে বাচ্চা দেখতে গেল । দূর থেকে দেখল, কাছে গেল না, কোলেও নিল না । এই শিশু অপরূপ রূপবতী হলেও সে মূর্তিমান পাপ ছাড়া কিছু না । তাকে দূর থেকে দেখা যায়, কোলে নেয়া যায় না ।

জুলেখা এক বোতল দুধ রেখে গিয়েছিল । সন্ধ্যার আগেই সেই দুধ শেষ হয়ে গেল । বাচ্চা কাঁদতে শুরু করল । তার জন্যে খাবার কীভাবে জোগাড় করবেন মাওলানা ভেবে পেলেন না । তাকে বাড়িতে রেখে খাবারের সন্ধানে কোথাও যাওয়া যাবে না । তিনি যেখানেই যান, তাকে কোলে নিয়েই যেতে হবে । বাচ্চাটার জন্যে কাঁথা দরকার, কাপড় দরকার । সেসবইবা কোথায় পাবেন ? বাচ্চা ঘনঘন পিসাব করছে । কাপড় বদলাতে হচ্ছে । এই মুহূর্তে মাওলানা তাকে নিজের একটা পাঞ্জাবি দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন । বাবু সেই পাঞ্জাবিও ভিজিয়ে ফেলেছে । মাওলানা অস্থির বোধ করলেন । সর্বপ্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব পরম করুণাময় আল্লাহপাকের । নিম্নশ্রেণীর প্রাণের জন্যে তা একশ' ভাগ সত্যি । প্রতিটি পিপড়ার খাবারের ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন । মানুষকে তিনি অস্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছেন বলে তার খাবার তাকেই সংগ্রহ করতে হয় ।

ক্ষুধায় অস্থির হয়ে শিশু খুবই কাঁদছে । মাওলানার চোখ দিয়েও পানি পড়ছে । তাঁর মন বলছে, আল্লাহপাক তাঁকে জটিল এক পরীক্ষায় ফেলেছেন । এই পরীক্ষা থেকে তিনি কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন বুঝতে পারছেন না । বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই তাঁকে বের হতে হবে । দেরি করা যাবে না ।

উঠানে লণ্ঠন হাতে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে । ইদরিস বাচ্চা কোলে নিয়ে বারান্দায় এসে দেখেন লাবুস ।



লাবুস বলল, বোনকে দেখতে এসেছি। তার নাম কী ?

মাওলানা বললেন, নাম জানি না। তার মা কী নাম রেখেছে বলে যায় নাই। তবে তার ইচ্ছা ছিল মেয়ে হলে নাম রাখবে মীরা।

লাবুস বলল, বোনকে আমার কোলে দিন।

বাচ্চা কাঁদছিল। লাবুসের কোলে উঠে কিছুক্ষণের জন্যে তার কান্না থামল। সে কৌতূহলী হয়ে নতুন মানুষটাকে দেখছে। লাবুস বলল, আমি আমার বোনের নাম রাখলাম পুষ্পরানি।

মাওলানা বললেন, তুমি কি এর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে ? এ ক্ষুধায় অস্থির হয়েছে।

লাবুস বলল, আমি সব ব্যবস্থা করেই আপনাকে নিতে এসেছি।

কী ব্যবস্থা করেছ ?

লাবুস বলল, একটা মেয়ে রেখেছি যে পুষ্পরানির দেখাশোনা করবে। আমার বোনের যা যা লাগবে তার সব ব্যবস্থা করেছি।

মাওলানা বললেন, ব্যবস্থা করেছি, ব্যবস্থা করেছি— এমন কথা বলবা না। এতে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহপাক। তোমার মাধ্যমে করেছেন।

লাবুস বলল, আমার ভুল হয়েছে। এখন আমার সঙ্গে চলেন।

মাওলানা বললেন, আল্লাহপাকের হিসাব সাধারণ মানুষের বোঝা সম্ভব না। আমি বাচ্চাটাকে কী খাওয়াব কী পরাব ভেবে খুব অস্থির হয়ে ছিলাম। কাঁদতে ছিলাম। আমার একবারও মনে হয় নাই যে, আল্লাহপাক সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

পুষ্পরানি আবার কাঁদতে শুরু করেছে। লাবুস পুষ্পরানিকে কন্ডল দিয়ে মুড়িয়ে রওনা হয়েছে। হারিকেন হাতে নিয়ে মাওলানা আগে আগে যাচ্ছেন। আয়াতুল কুরসি পড়তে পড়তে যাচ্ছেন। ছোট শিশুদের দিকে ভূত-প্রেতের নজর থাকে বেশি। সেই শিশু যদি রূপ নিয়ে আসে তাহলে সমস্যা আরো বেশি হয়। জিনরা সুন্দর মানবশিশু তাদের দেশে নিয়ে যেতে আগ্রহী থাকে বলে তিনি শুনেছেন। মানুষ জিনের বাচ্চা পালতে পারে না, কিন্তু জিন মানুষের বাচ্চা পালতে পারে— এটাও এক রহস্য। জগৎ রহস্যময়।

জামে মসজিদের ইমাম করিম সাহেবের স্ত্রী শরিফা আজ সারাদিন অভুক্ত। এমন না যে ঘরে খাবার নাই। খাবার আছে, কিন্তু সে খেতে পারছে না। ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া তার একশ' টাকা চুরি গেছে। চুরি কখন হয়েছে সে অনেক চিন্তা

করেও বের করতে পারছে না। গত রাতে চুরি হয়েছে এটা পরিষ্কার। তবে চোর একশ' টাকা ছাড়া আর কিছুই নেয় নি। টাকাটা সে রেখেছিল অতি গোপন জায়গায়— শুকনা বড়ুই-এর হাঁড়িতে। টাকার ওপর শুকনা বড়ুই বিছানো। চোর এই গোপন জায়গা থেকে টাকা বের করে নিয়ে গেল কীভাবে কে জানে !

শরিফা ঘটনাটা তার স্বামীকে বলতে পারছে না। তার ধারণা ঘটনা শুনলেই তার স্বামী খুব রাগ করবেন। স্বামীর কাছ থেকে ধমক বা কড়া কথা শুনতে তার একেবারেই ভালো লাগে না। একবার ধমক শুনলে তার কয়েকদিন মন খারাপ থাকে। শরিফা আজ সারাদিনই একমনে পাঠ করেছে— 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।' কারো মৃত্যুসংবাদ শুনলে এই দোয়া পাঠ করতে হয়, আবার কিছু হারিয়ে গেলে এই দোয়া পড়লে হারানো বস্তু ফিরে আসে। এই দোয়া পড়ে সে একবার তার হারিয়ে যাওয়া সোনার নাকফুল খুঁজে পেয়েছিল। উঠান ঝাড়ু দিতে সে শলার ঝাড়ু নিয়ে উঠানে গেছে। হঠাৎ দেখে রোদ পড়ে ঝাড়ুর ভেতর কী যেন ঝকঝক করে উঠল। নাকফুল ঝাড়ুর শলায় আটকে ছিল।

রাতে খেতে বসে করিম বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ? চোখ-মুখ শুকনা। জ্বর উঠেছে?

শরিফা বলল, শরীর ঠিক আছে।

কোনো বিষয় নিয়া কি চিন্তাযুক্ত?

আপনারে নিয়া চিন্তাযুক্ত।

করিম ভুরু কুঁচকে বললেন, আমারে নিয়া কী চিন্তা?

শরিফা বলল, জিন খোররম যে আপনারে ত্যক্ত করতেছে এই নিয়া চিন্তা।

করিম বললেন, এইসব নিয়া তুমি চিন্তা করবা না। আমার সমস্যা আমি সমাধান করব। এর মধ্যে সমাধান কিছুটা হয়েছে— মসজিদ থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বন্ধন দিয়েছি। ভূত-প্রেত-জিন-পরী এইটুকু রাস্তায় আর আসবে না।

বন্ধন দেওয়ার পরে তার আর দেখা পান নাই?

দুই দিন দেখেছি— জংলায় হাঁটতেছে, রাস্তায় উঠতে পরে নাই। চেষ্টা নিয়েছে, পারে নাই।

শরিফা বলল, একবার বন্ধন দিলে কতদিন থাকে?

চন্দ্র তারিখ হিসাবে থাকে। শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে বন্ধন দিলে পূর্ণিমা পর্যন্ত থাকে। যাই হোক, কথা চালাচালি বন্ধ। খাওয়া হলো ইবাদত। ইবাদতের সময় কথা বলা যায় না।

শরিফা বলল, ইবাদতের জন্য পুণ্য আছে না?

করিম বললেন, অবশ্যই আছে।



শরিফা বলল, যে শুকনা মরিচভর্তা দিয়া ভাত খাইতেছে তার পুণ্য বেশি, না-কি যে দশ পদ পোলাও-কোর্মা খাইতেছে তার পুণ্য বেশি ?

করিম বললেন, মরিচভর্তা দিয়া যে খাইতেছে তার পুণ্য অনেক অনেক বেশি ।

শরিফা বলল, আমার মনে হয় যে দশ পদ দিয়া খাইতেছে তার পুণ্য বেশি । আরাম কইরা মনের আনন্দে সে খাইতেছে বইলাই পুণ্য বেশি । শুকনা মরিচভর্তা দিয়া যে খাইতেছে সে বেজার হইয়া খাইতেছে ।

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, যা জানো না তা নিয়া বাহাস করবা না ।

আচ্ছা আর করব না ।

বারান্দায় পাটি দেও, জায়নামাজ দেও । আজ রাতে ঘুমাব না । সারারাত ইবাদত বন্দেগি করে কাটাব । ফজরের নামাজ শেষ করে ঘুমাতে যাব ।

কেন ?

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, কেন কী ? ইবাদত বন্দেগি করে রাত কাটানোর মধ্যে কোনো কেন নাই । ইবাদত বন্দেগি না করার মধ্যে কেন আছে ।

রাত মন্দ হয় নাই । বাজারের কোলাহল বন্ধ হয়েছে । রাত বারোটায় গোয়ালন্দ থেকে শেষ লঞ্চ আসে । সেটাও চলে এসেছে । করিম বারান্দায় জায়নামাজে বসে আছেন । তাঁর হাতে তসবি । জায়নামাজের এক কোনায় কেরোসিনের কুপি । কুপির লাল আলো করিমের মুখে পড়েছে । করিমকে ভীত দেখাচ্ছে । তিনি বারবারই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন । আজ একটা বিশেষ রাত । তিনি মজুকে একশ' টাকা দিয়েছেন । মজু বলেছে, সে যেভাবেই হোক আজ রাতেই কার্য সমাধা করে খবর দিয়ে যাবে । তখন তাকে আরো পঁচিশ টাকা দিতে হবে । করিমের পাঞ্জাবির পকেটে পঁচিশ টাকা আছে ।

মজু এখনো আসছে না । সে কখন কার্য সমাধা করবে তাও তাঁকে বলে নি । এখন মনে হচ্ছে কার্য সমাধা হবে শেষরাতে । দরজায় খুট করে শব্দ হলো । করিম বিরক্ত হয়ে তাকালেন ।

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, আপনি কি সত্য সত্যই সারারাত জাগবেন ?

দরজার ফাঁক দিয়ে শরিফাকে দেখা যাচ্ছে । করিম অত্যন্ত বিরক্ত হলেন । রাগী গলায় বললেন, ঘুমাইতে যাও, ইবাদত বন্দেগি করতেছি । এই সময় ত্যক্ত করবা না ।

শরিফা ঘুমুতে গেল । ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে না আসা পর্যন্ত সে একমনে হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার দোয়া পড়তে লাগল । ভাইজানের দেয়া একশ'টা টাকায় কত কিছুই সে কিনতে পারত ।

লাবুস তার বোনের সব ব্যবস্থা ভালোমতোই করেছে। বাগদি পাড়ার এক মেয়েকে আনিয়েছে। তার বয়স ষোল-সতেরো। নাম কালী। কালীর নিজের একমাস বয়েসি মেয়ে গতকাল মারা গেছে। মৃত সন্তানের শোকে সে কাতর। পুষ্পরাণীকে সে লাবুসের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে নিল। বিস্মিত গলায় বলল, হা ভগবান, আমার তুলসির চেহারার মতো চেহারা। হেই মুখ হেই চউখ। একটাই বেশকম— তুলসি ছিল কালা, আর এ চাঁদের মতো ফকফইক্যা।

কালী পুষ্পরানিকে শাড়ির আঁচলের আড়ালে নিয়ে নিয়েছে। পুষ্পরানি চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। কালীর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এই অশ্রু আনন্দের না বেদনার কে বলবে?

মাওলানা ইদরিস লাবুসের কাছে হিন্দু মেয়ের বুকের দুধ খাওয়া নিয়ে ক্ষীণ আপত্তি তুললেন। লাবুস বলল, দুধের কোনো হিন্দু-মুসলমান নাই। হিন্দু-মুসলমান মানুষের চিন্তায়। দুধের চিন্তার শক্তি নাই।

লাবুসের কথায় মাওলানা হকচকিয়ে গেলেন। ধর্ম নিয়ে এইভাবে তিনি কোনোদিন চিন্তা করেন নি। এই দিকে চিন্তা করা যেতে পারে।

পাকা দালানের দক্ষিণের সর্বশেষ ঘরটায় মাওলানার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। খাটে জাজিমের বিছানা। বিছানায় ফুলতোলা চাদর। খাটের পাশের টেবিলে কাসার জগভর্তি পানি, একটা কাসার গ্লাস। সবই ঝকঝক করছে।

হাদিস উদ্দিন মাওলানাকে খুবই খাতির-যত্ন করছে। গোসলের জন্যে গরম পানি করে দিয়েছে। মাওলানার সঙ্গে সে কলঘরে সাবান এবং ‘ফোড়ল’ নিয়ে ঢুকেছে, গায়ে সাবান ডলে দিবে।

মাওলানা বললেন, বাবা, আমি অন্যের সেবা নেই না। আমার নবীজি অন্যের সেবা নিতেন না। আমিও নেই না।

হাদিস বলল, আপনি তো নবী না। আপনি কেন সেবা নিবেন না?

মাওলানার সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে সে তাঁর মাথায় আধাবালতি গরম পানি ঢেলে সাবান দিয়ে গা ডলা শুরু করল।

গোসল সেরে মাওলানা ঘরে ঢুকতেই সে হুঁকা নিয়ে উপস্থিত। মাওলানা বললেন, আমি তামাক খাই না।

হাদিস উদ্দিন বলল, খান না, আইজ খাইবেন। শরীর আরাম চায়। এইটা শরীরের একটা আরাম।

মাওলানা হুঁকায় টান দিলেন। তামাকটা ভালো লাগছে না, কিন্তু গুড়ুক গুড়ুক শব্দটা কানে মধুর হয়ে বাজছে।



হাদিস উদ্দিন বলল, খানা কখন খাইবেন বইলেন। ভাত বসাব। ধোঁয়া উঠা ভাত খাওয়ার আলাদা মজা। খিচুড়ি খাইতে চাইলে বলবেন, খিচুড়ি রানব।

মাওলানা বললেন, লাবুস যা খায় তাই খেতে দিও। সে যখন খাবে আমিও তার সাথে খাব।

ছোটকর্তা তো রাইতে কিছু খায় না।

কেন?

জানি না কেন। উনার হিসাব বোঝা বড়ই কঠিন। অনেক রাইত পর্যন্ত ঘাটলায় বইসা থাকে। এক রাইতে দেখি জঙ্গলায় হাঁটতাকে।

এখন সে কোথায়?

ঘাটলায় বসা। তাঁর বিষয়ে আরেকটা কথা আছে। সময় সুযোগ হইলে আপনারে বলব।

এখনই বলো।

জে-না, এখন বলব না। গোপন একটা বিষয়। হুজুর, পায়ে একটু তেল দিয়া দেই?

মাওলানা বললেন, না-না, পায়ে হাত দিও না।

হাদিস উদ্দিন তেল মাখানো শুরু করল। বাটিতে করে তেল সে সঙ্গে করে নিয়েই এসেছে।

শ্বেতপাথরের ঘাটলায় লাবুস বসে আছে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। আকাশে প্রচুর মেঘ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। তখন যে খুব একটা আলো হচ্ছে তা-না। কারণ আজও ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে চাদর গায়ে মজু আসছে। চাদরের নিচে শার্টের বুক পকেটে সে একটা ক্ষুর নিয়ে এসেছে। তবে ক্ষুর সে ব্যবহার করবে না। ক্ষুর ব্যবহার করলেই চিৎকার শুরু হবে। এই ধরনের মৃত্যুর আগে মানুষ ভয়ঙ্কর চিৎকার করে। মজু ঠিক করেছে, সে পেছন থেকে গলা চেপে ধরবে। শব্দ করার কোনো সুযোগই মানুষটা পাবে না। মজু চাদরের আড়াল থেকে হাত বের করল। থাবার মতো বলশালী লোমশ হাত। দেখতেই ভালো লাগে। মজু বিড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল। সে ছাতিম গাছের নিচে দাঁড়াবে। সেখান থেকে বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

মজু খবর নিয়েই এসেছে যে লাবুস নামের মানুষটা অনেক রাত পর্যন্ত পুকুরঘাটে বসে থাকে। আজও সে বসে আছে এটা মজুর জন্যে ভালো। কাজ সহজ হয়ে গেছে। কুয়াশাটাও আজ ভালো সুবিধা দিচ্ছে। সব হচ্ছে

হিসাবমতো। মজু ছাতিম গাছের নিচে চলে এলো। তার দৃষ্টি লাবুসের দিকে। হঠাৎ সেই দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। মজু দেখছে, একজন লাবুস বসে নেই, দু'জন বসে আছে। সিঁড়ির দুই ধাপে দু'জন।

মজু চোখ বন্ধ করল। তাকে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে। সে বুঝতে পারছে তার চোখে ধাক্কা লেগেছে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় চোখে এ ধরনের ধাক্কা লাগে। মজু জানে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে খোলার পরপরই ধাক্কা কেটে যাবে। সে দেখবে মানুষ একটাই বসে আছে।

সে চোখ খুলল। মানুষ এখনো দু'জন। যে দৃশ্য সে দেখছে তা চোখের ধাক্কা না, অন্যকিছু। অন্যকিছুটা কী সে বুঝতে পারছে না। মজুর মন বলছে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক না। তাকে চলে যেতে হবে। এখনই যেতে হবে। মজু অনেক চেষ্টা করেও পা নাড়াতে পারল না। তার মনে হচ্ছে পায়ের প্রতিটি মাংসপেশি সীসার মতো হয়ে গেছে। সে কি চিৎকার করে সাহায্যের জন্যে কাউকে ডাকবে?

ছাতিম গাছের নিচে কে?

দু'জন মানুষের একজন কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে। একজন শুধু আছে। সে তাকিয়ে আছে মজুর দিকে। তাকে একটা প্রশ্ন করেছে। তাকে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

আপনি কে?

আমার নাম মজু। আমি লঞ্চঘাটে কুলির কাম করি।

এত রাতে এখানে কী?

মজু জবাব দিল না। লাবুস বলল, আপনার সঙ্গে একটা ক্ষুর আছে। ক্ষুর নিয়ে কেন এসেছেন?

মজু এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। ক্ষুর তার পকেটে। সে গায়ে একটা চাদরও দিয়েছে— এই মানুষটার ক্ষুরের কথা জানার কোনোই কারণ নেই।

লাবুস বলল, যান বাড়িতে যান।

মজু রওনা হলো। পা ফেলতে এখন আর তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

ইমাম করিমের স্ত্রী শলার ঝাড়ু দিয়ে উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। করিম সারারাত ইবাদত বন্দেগি করে এখন গুয়ে ঘুমাচ্ছে। মনে হয় দুপুর পর্যন্ত ঘুমাবে। শরিফার মাথায় গোপন এক ইচ্ছা কিলবিল করছে। বোরকা পরে কিছুক্ষণের জন্যে সে কি বের হবে? মূলসড়ক পাশে রেখে জংলার ভেতর দিয়ে চলে যাবে। হরিচরণ বাবুর



কবরের (যার বর্তমান নাম মোহম্মদ আহম্মদ) পাশের আমগাছে মাথার এক গাছি সুতা বেঁধে বলবে— আল্লাহপাক দয়া কর। একশ' টাকার নোটটা পাওয়ায়ে দাও।

যেতে আসতে বেশি সময় লাগার কথা না। এর মধ্যে করিমের ঘুম ভাঙলে খুব সমস্যা হবে না। সে বলবে খাওয়ার পানি আনতে গিয়েছিল। বান্ধবপুরে দু'টা টিউবকল। একটা মুসলমানদের জন্যে, একটা হিন্দুদের জন্যে।

হিন্দু টিউবকলটা ঘরের কাছে। মুসলমান টিউবকল একটু দূরে। পানি আনতে দেরি হতেই পারে। উঠান ঝাট অসমাপ্ত রেখেই শরিফা অতি দ্রুত ঘরে ঢুকে বোরকা পরল। এলুমিনিয়ামের কলসি হাতে বের হয়ে গেল।

বনের ভেতর দিয়ে পথ। শরিফা ঝড়ের গতিতে যাচ্ছে। তার ভয় ভয় করছে, আবার ভালোও লাগছে। মনে হচ্ছে তার বয়স কমে গেছে। শরীর নিয়ে বিব্রত থাকার মতো বয়সও হয় নি। ইচ্ছা করলেই সে বোরকা খুলে ফেলতে পারে।

শরিফা আমগাছের ডালে সুতা বাঁধল। চোখ বন্ধ করে বলল, আল্লাহপাক, দয়া কর। আমি দরিদ্র মেয়েমানুষ। ভাইজান আমাকে আদর করে একশ'টা টাকা দিয়েছেন। কতকিছু কিনব শখ করে আছি। তুমি টাকাটা মিলায়ে দাও।

সুতা বেঁধে শরিফা ফিরছে। জঙ্গলের ভেতর ঢুকেই সে বোরকার মাথার পর্দা সরিয়ে দিল। জঙ্গলাভর্তি গাছপালা। গাছপালার সামনে পর্দা করার কিছু নাই।

মা, এখানে কী করেন ?

শরিফা চমকে উঠল। বাঁদিকে শিমুল গাছের নিচে লাবুস দাঁড়িয়ে আছে। শরিফার উচিত দ্রুত বোরকার পর্দা ফেলে দেয়া। কিন্তু তার হাত-পা কেমন শক্ত হয়ে গেছে।

মা, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি লাবুস। এক রাতে আপনি আমাকে আদর করে খানা দিয়েছিলেন।

শরিফা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি যাই। আমি যাই।

লাবুস বলল, আমি আপনাকে জংলা পার করিয়ে দেই ?

শরিফা বোরকার পর্দা ফেলে দিয়ে ভীত গলায় বলল, লাগবে না লাগবে না।

শরিফা দৌড়াচ্ছে। যে-কোনো সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে এমন অবস্থা।

বাড়ির উঠানে ঢুকে শরিফা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাড়ি সুনসান। করিমের ঘুম এখনো ভাঙে নি। ঘুম ভাঙলে সে শরিফাকে না দেখে চিন্তিত হয়ে উঠানে বসত।

শরিফা ঘরে ঢুকল। করিম চাদর গায়ে ঘুমাচ্ছে। শরিফা বোরকা খুলে উঠানে এসে অসমাপ্ত ঝাড়ু শুরু করল। কলাপাতার বেড়ার ওপাশ থেকে কেউ একজন গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, ইমাম সাহেব আছেন? উনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শরিফা জবাব দিল না। জবাব দেবার অর্থ পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা।

বেড়ার ওপাশ থেকে আওয়াজ এলো, আমার নাম মজু। ইমাম সাহেব একটা কাজে আমাকে একশ' টাকা দিয়েছিলেন। কাজটা হয় নাই। আমি টাকাটা ফেরত দিব। এখনই ফেরত দিতে হবে। আমি লঞ্চে উঠব। কইলকাতা যাব।

শরিফা দাঁড়িয়ে আছে। একশ' টাকার কথা উঠেছে। ব্যাপারটা কী? করিম একশ' টাকা কোথায় পেয়েছে?

মজু বলল, আপনে বাড়ির ভিতরে যান। আমি উঠানে টাকা রাইখা যাব। জলচৌকির উপর রাখব।

শরিফা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। তার বুক ধক ধক করছে। ঘটনাটা কী? জলচৌকির ওপর পাথর চাপা দেয়া নোটটা যে শরিফার এই বিষয়ে শরিফা নিশ্চিত। নোটের এক কোনায় হলুদের দাগ। গাছে চুল বাঁধায় কাজ হয়েছে। আল্লাহপাক শরিফার টাকা শরিফাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে এখন শরিফার মনে হচ্ছে কাজ না হলেই ভালো হতো। কিছু জিনিস গোপন থাকাই ভালো।

শরিফা!

শরিফা চমকে তাকাল। ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠেছে। তার গলায় বিরক্তি। ফজর ওয়াক্ত পার হয়েছে, তুমি আমারে ডাকলা না— এটা কেমন কথা! তুমি নিজে কি নামাজ পড়েছ?

পড়েছি।

নিজে ঠিকই পড়লা, আমারে ডাকলা না?

আপনে সারা রাইত জাগনা ছিলেন এই জন্যে ডাকি নাই।

বিরাত অন্যায় করেছ শরিফা। বিরাত অন্যায়। তাড়াতাড়ি অজুর পানি দেও।

করিম অজু করছেন। শরিফা জলচৌকিতে বসা করিমের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে চোখ ফেরাতে পারছে না। এই মানুষটা তার একশ' টাকা চুরি করেছে? এই মাওলানা মানুষ। তার স্বামী। হাদিস কোরান জানা স্বামী। তাকে কি শরিফা সরাসরি প্রশ্ন করবে? না-কি চুপ করে থাকবে?

করিম অজুর শেষে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, কী দেখো?



আপনারে দেখি ।

আমারে দেখার কী আছে ?

শরিফা বলল, আইজ আপনারে সুন্দর লাগতেছে । চেহারায় নুরানি ফুটেছে ।  
আপনারে একটা প্রশ্ন করব । নামাজের আগে করব না পরে করব বুঝতেছি না ।

কর, এখনই কর । আর একটা কথা, সব সময় মাথার মধ্যে প্রশ্ন নিয়া ঘুরবা  
না । বলো প্রশ্নটা কী ?

শরিফা বলল, হাদিস কোরান মতে চুরির শাস্তি কী ?

হাদিস কোরান মতে চুরির শাস্তি ভয়ঙ্কর । প্রথমবার যে চুরি করবে তার ডান  
হাত কেটে ফেলতে হবে । তারপরেও চুরি করলে বাম হাত ।

আপনার ডান হাত কাটা গেলে আপনে চলবেন কীভাবে ?

কী বললা ?

শরিফা চুপ করে রইল । করিম বলল, একশ' টাকা হারায় তোমার মাথা  
খারাপ হয়ে গেছে । এখন আমারে চোর ভাবতেছ । আল্লাহপাক এই কারণে  
তোমারে কঠিন শাস্তি দিবেন । শাস্তি থেকে বাঁচার একটাই পথ । তওবা করা ।  
আমার সঙ্গে তিনবার বলো— তওবা আস্তাগফিরুল্লা ।

তওবা আস্তাগফিরুল্লা ।

আবার বলো তওবা আস্তাগফিরুল্লা ।

শরিফা আবার বলল, তওবা আস্তাগফিরুল্লা । বলতে বলতে সে কী মনে  
করে হেসে ফেলল । মাওলানা ফিগু গলায় বললেন, হাসো কেন ? কিছুই বুঝলাম  
না, এখানে হাসির কী আছে !

শরিফা বলল, আমার হারানো টাকা আমি খুঁজে পেয়েছি, এইজন্যে মনের  
আনন্দে হাসতেছি । এই দেখেন টাকা । এক কোনায় হলুদের দাগ ।

শাড়ির আঁচল খুলে শরিফা টাকা বের করেছে । মেলে ধরেছে ।

টাকা কই পাইলা ?

আপনে একজনের টাকাটা দিয়েছিলেন, সে ফিরত দিয়া গেছে ।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? তুমি এইসব কী বলতেছ ?

টাকা আপনে আমার বরই-এর হাঁড়ি থাইকা চুরি করেন নাই ?

কী বলো তুমি !

শরিফা ঠান্ডা গলায় বলল, আপনে নামাজ শেষ কইরা স্থির হয় বসেন ।  
আমি আপনার হাত কাটব । কুড়াল দিয়া এক কোপ দিব ।

নাউজুবিল্লাহ । নাউজুবিল্লাহ ।

নাউজুবিল্লাহ বইলা লাভ নাই। আমি সত্যি হাত কাটব। বিসমিল্লাহ বইল্যা এক কোপ দিব।

হঠাৎ শরিফার হাসি পেয়ে গেল। মানুষটা ভয় পেয়েছে। মনে হয় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছে তার হাত কাটা যাবে। শরিফার সামান্য মায়াও লাগছে।

করিম বলল, শরিফা তুমি পাগল। আমি পাগল স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করব না। আমি ঠান্ডামাথায় পশ্চিমমুখী হইয়া তোমারে তালাক দিতেছি। তালাক তালাক তালাক।

শরিফা বিড়বিড় করে বলল, আমারে তালাক দিলেন ?

হ্যাঁ দিলাম। শুনতে না পাইলে আরেকবার বলতেছি— তালাক তালাক তালাক। শুনেছ ?

শুনেছি।

শরিফা বড় করে নিঃশ্বাস নিল। সে ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছে। চারপাশে কী ঘটেছে বুঝতেও পারছে না। গরম বোধ হচ্ছে। কপাল ঘামছে। ইচ্ছা করছে দিঘির ঠান্ডা পানিতে গলা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে।

করিম বলল, আমি যে তোমারে তালাক দিয়েছি এটা কি বুঝেছ ?

বুঝেছি।

খোরপোষের টাকা এখন দিতে পারব না। ধীরে সুস্থে দিব। হাতে টাকা নাই।

আচ্ছা।

আমি এখন বেগানা পুরুষ। আমার দিকে এইভাবে তাকাবা না। মাথায় ঘোমটা দাও। ঘরে যাও। ভাটির দেশে তোমারে পাঠাইবার ব্যবস্থা নিতেছি। ভাই বেরাদরের সঙ্গে থাকবা।

আমি কোনোখানে যাব না। এইখানেই থাকব।

অসম্ভব।

করিম জায়নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজ দ্রুত শেষ করে খোঁজ নিতে হবে ঘটনা কী ঘটেছে। কিছুক্ষণ আগে তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এই নিয়ে তার মনে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আপদ বিদায় করতে হবে। কেরায়া নৌকায় করে বদ মেয়েটাকে বাপের দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। ভাগ্য ভালো মেয়েটার পেটে সন্তান নাই। সন্তান থাকলে ইদ্দতের সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হতো।

শরিফা কাঁদছে। শব্দ করে কাঁদছে। করিম নামাজে মন দিতে পারছেন না।





শিবশংকরের শরীর কয়েকদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। দুপুরের দিকে নিয়ম করে জ্বর আসছে। সন্ধ্যার পর পর জ্বর সেরে যাচ্ছে। তাকে কুইনাইন মিকচার দেয়া হচ্ছে। অতি তিক্ত সেই মিকচার সে পেটে রাখতে পারছে না। খাওয়ার পর পর বমি হয়ে যাচ্ছে। শিবশংকরের স্বাস্থ্য শিক্ষক গোপীনাথ বল্লভ ভালো দুশ্চিন্তায় আছেন। শিবশংকরকে নিরন্তর উপবাসের বিধান দিয়েছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস। উপবাসে শরীরের বিষ নষ্ট হয়। শিবশংকরের শরীর বিষাক্ত হয়ে গেছে বলে তাঁর ধারণা।

শিবশংকর উপবাস করে যাচ্ছে। খাদ্যে এমনিতেই তার রুচি নেই। উপবাস তার জন্যে ভালো। সে জ্বরের সময়টা চাদর গায়ে গুয়ে গুয়ে কাটাচ্ছে। হাতের কাছে বইপত্র রাখছে। পড়তে ইচ্ছা করলে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে। চামড়ায় বাঁধানো একটা খাতাও তার আছে। মাঝে মাঝে খাতায় ডায়েরির মতো লেখা লিখছে।

এক দুপুরে জ্বরের প্রবল ঘোরে সে খাতায় লিখল—

সাধনা = ফসল

সাধনা + প্রার্থনা = ফসল

কাজেই প্রার্থনা = ০

এর অর্থ প্রার্থনা মূল্যহীন। শিবশংকরের ধারণা হলো সে বিরাট এক আবিষ্কার করেছে। অংক দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, প্রার্থনা হলো শূন্য। মূল্যহীন। সে তার আবিষ্কারের কথা গোপীনাথকে বলল। তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, তুমি বিকারের ভেতর আছ। জ্বরের কারণে এই বিকার তৈরি হয়েছে। তিনি শিবশংকরকে পাকস্থলী ধৌত করার বিধান দিলেন। বিকারের কেন্দ্রবিন্দু পাকস্থলী। পাকস্থলী ধৌত করার অর্থ বিকার ধৌত করা।

গোপীনাথের পাকস্থলী ধৌত করার পদ্ধতিটা জটিল এবং কষ্টকর। এক জগ লেবু মেশানো পানি পুরোটা খেয়ে ফেলতে হবে। ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট বসে থাকতে হবে। তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে পাকস্থলীর পুরো পানি ফেলে দিতে হবে।

শিবশংকর কষ্টকর এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। কোনোরকম আপত্তি করছে না। পাকস্থলী ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় তার বিকার যে দূর হচ্ছে তা না। বরং আরো বাড়ছে। শিবশংকর তার আবিষ্কারের বিষয়টা চিঠি লিখে দু'জনকে জানিয়েছে। একজন তার বাবা মনিশংকর। অন্যজন বিখ্যাত মানুষ— শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনিশংকর পুত্রের চিঠির জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছেন। তিনি পুত্রের মানসিক অবস্থা নিয়ে যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তা তাঁর চিঠিতে বোঝা যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন—

বাবা শিবশংকর,

তোমার পত্র পাঠ করিয়া দুঃখিত এবং চিন্তিত হইয়াছি। তোমাকে একা রাখা ঠিক হয় নাই। তোমার আশেপাশে আমার থাকা উচিত ছিল। আমি নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত বলিয়া তাহা পারি নাই। ইহা আমার ব্যর্থতা। তুমি প্রমাণ করিয়াছ প্রার্থনা = ০, কিন্তু বাবা আজ তুমি যে বাঁচিয়া আছ তার মূলে আছে প্রার্থনা। তোমার আরোগ্য সাধনের সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন হরিচরণ বাবু প্রার্থনার মাধ্যমে তোমার জীবন রক্ষা করেন। এই কাহিনী বান্ধবপুরের সকলেই জানে। তুমিও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অবগত আছ।

এখন আমার আদেশ, তুমি মাথা হইতে এই ধরনের উদ্ভট এবং ক্ষতিকর চিন্তা পরিত্যাগ করিবে এবং কায়মনে পাপচিন্তার জন্যে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

গোপীবাবুর কাছে গুনিলাম তোমার শরীর ভালো যাইতেছে না। আমি বিশেষ চিন্তাযুক্ত। মন্ত্রপূত একটি শক্তিকবজ পাঠাইলাম। ভক্তি সহকারে গলায় ধারণ করিবে। যেন অন্যথা না হয়।

ইতি তোমার চিন্তাযুক্ত পিতা

শ্রী মনিশংকর

রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চিঠির জবাব এলো না। শিবশংকর তা আশাও করে না। বড় মানুষদের কাছে সবাই চিঠি লেখে। এত চিঠির জবাব দেয়া সম্ভব না।

মন্ত্রপূত মাদুলির গুণেই হোক কিংবা পাকস্থলী ধৌতকরণ চিকিৎসার কারণেই হোক শিবশংকরের রোগ খানিকটা সেরেছে। পালা জ্বর বন্ধ হয়েছে।



সে আগের মতো ঘুরতে বের হচ্ছে। হরিচরণের কবরের পাশে বেড়ে ওঠা আমগাছের চারদিকে রুটিন করে ঘুরছে। এই কাজটা করতে কেন জানি তার ভালো লাগে। নিজেকে তখন ইলেকট্রন মনে হয়। ইলেকট্রন যেমন অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে সেও সেরকম ঘুরছে। আমগাছটা যেন নিউক্লিয়াস। প্রোটন এবং নিউট্রন।

বেলা কম হয় নি, দশটার ওপরে বাজে। শিবশংকর আমগাছের চারদিকে ঘুরছে। তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কারণ ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে। এই বৎসরটা মনে হয় কুয়াশার বছর। শ্রাবণ মাস শুরু হয়েছে। টানা বৃষ্টি হবার কথা। তার বদলে কুয়াশা। কথায় আছে— ‘মেঘের দিনে কুয়াশা, রাজকপালও ধুয়াশা।’ বড় কোনো দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটবে।

শিবশংকর নিজের মনে আছে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছে, I am Mr. Electron. হঠাৎ সে শুনল অতি মিষ্টি সুরে কেউ যেন কথা বলল, আপনার কী হয়েছে ?

শিবশংকর দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার ভেতর থেকে কিশোরী এক মেয়ে বের হয়ে এলো। মেয়েটির পরনে ঘাগড়া জাতীয় পোশাক। মাথায় ঘোমটার মতো করে দেয়া ওড়না। মেয়েটির গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর। বড় বড় চোখ। চোখের মণি ঘন কৃষ্ণবর্ণ। মুখ গোলাকার। নাক সামান্য চাপা। কুয়াশার ভেতর মেয়েটাকে দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীর মতো। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটা মুসলমান। মেয়েটা আবার বলল, আপনার কী হয়েছে ?

শিবশংকর বিব্রত গলায় বলল, কিছু হয় নাই তো।

চক্কর দিচ্ছেন কেন ?

এম্মি। এটা আমার খেলা।

মেয়েটি বলল, ছোট বাচ্চারা এরকম খেলে। আপনি কি ছোট বাচ্চা ?

শিবশংকর বলল, তুমি বান্ধবপুরের ?

মেয়েটি বলল, আমার নাম আতর। আমি ধনু শেখের মেয়ে।

কোলকাতায় থাকো ?

হঁ। জাপানিরা বোমা ফেলবে এইজন্যে চলে এসেছি।

স্কুলে পড় ?

হঁ। বেগম রোকেয়ার স্কুলে।

কোন ক্লাসে ?

ক্লাস এইট।  
তুমি ছাত্রী কেমন?  
ভালো না। ক্লাস সেভেনে একবার ফেল করেছি।  
আমেরিকা কে আবিষ্কার করেছেন জানো?  
জানি। কলম্বাস।  
শুধু কলম্বাস বলা ঠিক না। বলা উচিত ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ভাস্কো দা গামা  
কে জানো?  
জানি না। আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন? আপনি কি বেলারানি?  
বেলারানি কে?  
বেলারানি আমাদের ইংরেজি আপা। শুধু প্রশ্ন করেন। কেউ প্রশ্নের উত্তর  
দিতে না পারলে বলেন, You goat. আমরা উনাকে কী ডাকি জানেন? আমরা  
ডাকি মিসেস গোটরানি। তাঁর একটা ছেলে আছে। হাবাগোবা। নাম অক্ষয়।  
আট বছর বয়স। একদিন স্কুলে নিয়ে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, এই  
তোর নাম কী? সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, অততয় বাবু।  
শিবশংকর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। কী সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে মেয়েটা  
কথা বলে যাচ্ছে। যেন শিবশংকর তার অনেক দিনের চেনা কেউ। মেয়েটার  
কথা বলার ভঙ্গিটাও কী সুন্দর! হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। অভিনয়ও  
করছে। তোতলামির অভিনয় করে কী সুন্দর বলল— অততয় বাবু।  
শিবশংকর বলল, তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞেস করলে না।  
আতর বলল, আমি সবাইকে চিনি। আপনাকেও চিনি। আপনি মনিশংকর  
চাচার ছেলে শিবশংকর। আপনি গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন। হয়েছে না?  
হয়েছে।  
আমি এখন যাই। অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি। আল্লাহ  
আমাকে পাপ দিবে।  
শিবশংকর তাকিয়ে আছে। আতর নামের মেয়েটা ছোট ছোট পা ফেলে  
দ্রুত যাচ্ছে। শিবশংকরের কাছে মনে হলো, হাঁটার মধ্যেও এই মেয়ের নাচের  
ভঙ্গি আছে। মেয়েটির ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যে সে চোখ ফেরাতে পারল  
না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার জন্যে তার একটু লজ্জাও লাগছে। তার কাছে  
মনে হচ্ছে বান্ধবপুরের সবাই তাকে দেখছে।



ধনু শেখ অনেক বেলায় নাশতা খেতে বসেছেন। বাটিভর্তি মুরগির মাংস এবং চালের আটার রুটি। তাঁর হজমের সমস্যা হচ্ছে। যা খান কিছুই হজম হয় না। বুক জ্বালাপোড়া করে। কবিরাজি চিকিৎসা চলছে। কোলকাতার কবিরাজ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী মিশ্র ঠাকুর চিকিৎসা করছেন। গুরুপাক খাবার সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছেন। নিষেধ মানা ধনু শেখের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

ধনু শেখ খেতে বসেছেন উঠানের জলচৌকিতে। চায়ের কাপে ওষুধ তৈরি করা আছে। খাওয়া শেষ করেই ওষুধ খাবেন। ওষুধ খালিপেটে খাওয়ার কথা। তিনি এই নিয়ম মানেন না। তাঁর মতে ওষুধ হচ্ছে ওষুধ। ওষুধের আবার খালিপেট ভরাপেট কী? যত ফালতু বাত।

নাশতার মাঝখানে আতর উঠানে উপস্থিত হলো। ধনু শেখ বললেন, কই ছিলি?

আতর বলল, বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বান্ধবপুরে বেড়ানোর কী আছে?

অনেক কিছুই আছে। নদী আছে, জঙ্গল আছে, পুকুর আছে।

একা কোনোখানে যাবি না।

একা তো যাই নাই। দুইজন সঙ্গে নিয়ে গেছি।

ধনু শেখ বিস্মিত হয়ে বললেন, দুইজন কে?

আতর নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, কান্ধের দুই ফেরেশতা নিয়ে গেছি। একজনের নাম কেরামন, আরেকজনের নাম কাতেবিন। ঠিক আছে না বাবা?

ধনু শেখ হতাশ গলায় বললেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে বলা ছাড়া তাঁর উপায়ও নেই। তিনি তাঁর এই মেয়েকে অত্যধিক স্নেহ করেন। তাঁর তিন মেয়ের মধ্যে একজনই বেঁচে আছে। মা মরা মেয়ে। মেয়ের মা বেদানা গত বৎসর হঠাৎ করে মারা গেছে। ধনু শেখ বিনা কারণে কাউকে এভাবে মারা যেতে দেখেন নি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে পান মুখে দিয়ে শুয়েছে। শোবার আগে দাসীকে বলেছে, আইজ আরামের ঘুম দিব। কেউ যেন না ডাকে। মশারি ফেলে দিও। দিনেরবেলা মশা যখন ত্যক্ত করে তখন খুব খারাপ লাগে। রাতের মশা সহ্য করা যায়। দিনের মশা না।

দাসী মশারি খাটাতে গিয়ে দেখে, মুখভর্তি পান নিয়ে বেদানা মরে পড়ে আছে।

মায়ের মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে আতর দুইদিন দুই রাত কিছুই মুখে দেয় নি। পানি পর্যন্ত না। তৃতীয় দিনে সে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। ধনু শেখকে

বলল, বাবা, মা পরকালে খুব ভালো জায়গায় স্থান পেয়েছেন। সুখী এবং পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে এখন তাঁর যোগাযোগ। এখন আর তাঁকে নিয়ে মনে কষ্ট পাওয়ার কিছু নাই। ধনু শেখ বিস্মিত হয়ে বললেন, তোকে বলেছে কে ?

আতর স্বাভাবিক গলায় বলল, মা বলে গেছেন।

ধনু শেখ জানেন এইসব কল্পনার কথা। মৃতমানুষ কখনো কিছু বলে যায় না। তাদের কিছু বলার ক্ষমতা থাকলে জীবিত মানুষদের সারাক্ষণ মৃতদের কথা শুনতে হতো। তারপরেও মেয়ের মনের শান্তির জন্যে তিনি বলেছেন, খুবই ভালো সংবাদ দিলা মা। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। বান্ধবপুরের ইমাম করিমকে পত্র দিতেছি, সে যেন মসজিদে মিলাদ এবং তবারুকের আয়োজন করে।

মাওলানা ইদরিসের মেয়ে মীরার বয়স তের মাসের কয়েকদিন বেশি। এই বয়সে শিশুরা বাবা, মা, পানি... এরকম অনেক কথা বলে। মীরা একটি শব্দ ছাড়া কোনো কথাই বলে না। সে শব্দটা হলো—রাম। ইদরিসের মনে এই নিয়ে খুবই কষ্ট। এত শব্দ থাকতে তাঁর মেয়ে রামনাম শিখল কেন ? যখন তিনি বলেন, মীরা মা, বলো বাবা। বাবা। আমি তোমার বাবা। বলো বাবা।

মীরা বলে, রাম।

ইদরিস বড়ই বিরক্ত হন। ছোট্ট মীরা মনে হয় বাবার বিরক্তি ধরতে পারে। সে তার বাবাকে আরো বিরক্ত করার জন্য মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, রাম। রাম।

কালী বলে যে মেয়েটা মীরার দেখাশোনা করে তাকে ইদরিস জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি আমার মেয়েটার সামনে রামনাম নাও ? তাকে রাম বলা তুমি শিখিয়েছ ?

কালী দুঃখিত হয়ে বলেছে, মুসলমান মেয়েরে আমি রামনাম কেন শিখাব বলেন ? আমার ধর্মভয় আছে না ?

মেয়েটা আপনাআপনি রাম ডাকা শুরু করল ?

তাই তো দেখি। বিরাট আশ্চর্য ব্যাপার।

মেয়ের ‘রাম’ ডাকার জন্যে মাওলানা ইদরিস যতটা দুঃখিত তারচেয়ে অনেক দুঃখিত হাদিস উদ্দিন। সে মীরার কানের কাছে ক্রমাগত বলে—মরা মরা মরা। রাম উল্টো করে মরা বলা। এতে যদি দোষ কাটে।

দোষ কাটে না। মীরা আরো বেশি করে বলে, রাম রাম। বলে আর হাসে। হাত-পা নাড়ে।



একজন মুসলমান মেয়ে জন্মের পর থেকে রামনাম জপ করছে, এই খবরটা বান্ধবপুরে ভালোই ছড়িয়েছে। অনেকের ধারণা মীরার ভেতর দেবী সীতা প্রকাশিত হয়েছেন। তিনিই স্বামী রামের নাম জপ করছেন। এয়োতি মেয়েরা তাদের শাঁখা এবং সিঁদুরের কৌটা মীরাকে দিয়ে ছুঁইয়ে নিচ্ছে। সবাই ভক্তিভরে মীরাকে কোলেও নিচ্ছে। অতি ভক্তিমতীরা মীরার পায়ে প্রণামের ভঙ্গিও করছে।

মীরার বিষয়ে কথাবার্তা শুনে তাকে দেখতে এসেছে শিবশংকর। মীরাকে কোলে নিয়ে শ্রীনাথ বাগানে হাঁটছিলেন। শিবশংকরকে দেখে মীরা কোলে ওঠার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। শিবশংকর তাকে কোলে না নিয়ে বলল, খুকি তোমার নাম কী ?

মীরা ফিক করে হেসে বলল, রাম।

শ্রীনাথ বাবু বললেন, বুঝলে শিবশংকর, এই মেয়ের মুখে রাম ছাড়া কোনো কথা নেই। তাকে যাই জিজ্ঞেস করো সে বলবে রাম। ভক্তিভরে বলে।

শিবশংকর বলল, কাকু, আমার ধারণা আপনি তাকে রামনাম শিখিয়েছেন।

শ্রীনাথ চোখ কপালে তুলে খড়খড়ে গলায় বললেন, এইরকম ধারণার কারণ কী ?

শিবশংকর বলল, আপনি রামভক্ত মানুষ। দিনরাত রামায়ণ পড়েন।

মুসলমান এই মেয়েকে রামায়ণ শিখিয়ে আমার লাভ ?

আপনি পুণ্যের আশায় এই কাজ করেছেন। আপনি ভেবেছেন একটা মুসলমান মেয়েকে রামনাম শেখানোর আপনার পুণ্য হয়েছে। পুণ্যের আশায় অশিক্ষিত মানুষরা অনেক অন্যায় করে।

তুমি আমাকে অশিক্ষিত বললা ?

আপনাকে বলি নাই। যারা অশিক্ষিত তাদের বলেছি।

আমি খাঁটি ব্রাহ্মণ। তুমি কি জানো তোমার এই আচরণের জন্যে আমি যদি পৈতা ছুঁয়ে অভিশাপ দেই তুমি গলায় রক্ত উঠে মারা যাবে।

শিবশংকর স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনি অযথাই আমার ওপর রাগ করছেন। তারপরেও আপনি যদি অভিশাপ দিতে চান দিতে পারেন। অভিশাপ হলো শূন্য। আমি অংক দিয়ে প্রমাণ করতে পারি।

শ্রীনাথ রাগে থরথর করে কাঁপছেন। শিবশংকর স্বাভাবিক গলায় বলছে —

জীবন = মৃত্যু

জীবন + অভিশাপ = মৃত্যু

কাজেই অভিশাপ = ০

শ্রীনাথ বললেন, তোমার পিতা বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তার ছেলে হয়ে তুমি কুলঙ্গার হয়েছ। তোমার মুখদর্শনও পাপ।

শিবশংকর চলে এলো। আজ তার মন খুব ভালো, কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ তার মতো নগণ্য একজন মানুষের চিঠির জবাব দিয়েছেন। চিঠি পড়ে শিবশংকর লজ্জার মধ্যে পড়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ তার চিঠি পড়ে ভেবেছেন যে, শিবশংকর গুরুগম্ভীর বয়স্ক কোনো মানুষ। কলেজের ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

ভবদীয় শিবশংকর,

আপনার পত্র হস্তগত হইয়াছে। আপনি অংকের মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন প্রার্থনা সমান শূন্য। আপনার অংকে কিছু কৌশল আছে। কৌশল মানেই ফাঁকি। ভগবান ফাঁকির উর্ধ্বে। আপনি যে সাধনার কথা বলিয়াছেন সেখানেও কিন্তু প্রার্থনা জড়িত। প্রার্থনা বাদ দিয়া সাধনা হয় না।

ইতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
জোড়াসাঁকো

শিবশংকরের খুব ইচ্ছা চিঠিটা সবাইকে পড়ায়। পড়বার মতো কাউকে সে পাচ্ছে না। এই চিঠির মর্ম উদ্ধার করার পক্ষে সম্ভব না। তবে তার ধারণা আতর মেয়েটা হয়তো চিঠির গুরুত্ব বুঝতে পারবে। মেয়েটার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না এটাই সমস্যা। রোজ ভোরে আমগাছের চারদিকে চক্কর দেবার সময় তার মনে হয় এই বুঝি কুয়াশার ভেতর দিয়ে আতর এসে দাঁড়াবে। তাকে দেখে ঠোট চেপে হাসবে। শিবশংকর ঠিক করেছে সাতদিন সে অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে দেখা না হলে চলে যাবে ধনু শেখের বাড়িতে।

ধনু শেখ স্নানপর্বের আগে গায়ে রসুন ভেজানো সরিষার তেল মাখছিলেন। এই অবস্থায় খবর পেলেন মনিশংকরের ছেলে শিবশংকর এসেছে। সে আতরের সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুব না-কি জরুরি। ধনু শেখের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি শিবশংকরকে উঠানে ডেকে পাঠালেন।

তুমি শিবশংকর ?

শিবশংকর হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমার মেয়ে আতরকে চেন ?

চিনি।



কীভাবে চেন ?

তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে।

কী কথা হয়েছে ?

নানান বিষয়ে কথা হয়েছে।

তার সঙ্গে তোমার প্রয়োজনটা কী ?

তাকে আমি একটা চিঠি পড়তে দিব।

ধনু শেখের হতভম্ব ভাব কাটছে না। বরং বাড়ছে। তিনি চাপা গলায় বললেন, আতর বাড়িতে আছে। তবে তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। তুমি আর কখনো এ বাড়িতে আসবেও না।

শিবশংকর বলল, আচ্ছা।

ধনু শেখ বলতে চাচ্ছিলেন, এ বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি তোমাকে দেখি তাহলে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব। কঠিন কথাটা বলতে পারলেন না। মনিশংকরের ছেলেকে এমন কথা বলা যায় না। মনিশংকর বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে তাকে তার পুত্রের কর্মকাণ্ড অবশ্যই জানানো উচিত। তিনি ঠিক করলেন, আজ দিনের মধ্যেই মনিশংকরকে চিঠি দিয়ে সব জানাবেন। এই সঙ্গে আতরকেও সাবধান করে দিতে হবে।

আতরের বিষয়ে তিনি খুবই দৃষ্টিভ্রান্ত আছেন। মেয়েটা এমন একটা কাণ্ড করেছে যার কাছে শিবশংকরের সঙ্গে আলাপের ঘটনা কিছুই না। তিনি শুনেছেন আতর নৌকা নিয়ে রঙিলা নটিবাড়ি দেখতে গিয়েছিল। এই বিষয়ে আতরের সঙ্গে এখনো কথা হয় নাই। কীভাবে কথা বলবেন বুঝতে পারছেন না বলেই কথা হয় নাই। আতরকে বান্ধবপুরে আনাটাই ভুল হয়েছে। যে কর্মকাণ্ড সে করছে তারচেয়ে কোলকাতায় থেকে জাপানিদের বোমা খাওয়াও অনেক ভালো।

ধনু শেখ ডাকলেন, আতর মা কোথায় ?

ঘর থেকে আতর বের হলো না। আতরের দাসী হামিদা বের হলো। হামিদার চেহারা রান্ধসের মতো। দাঁত উঁচু। মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ নষ্ট। সেই নষ্ট চোখ অক্ষিকোটর থেকে সামান্য বের হয়ে আছে।

অবিবাহিতা অতি রূপবতী কন্যাদের জন্যে কুৎসিতদর্শন দাসী রাখতে হয়। হামিদাকে এই কারণেই রাখা হয়েছে।

হামিদা ঘোমটা দিয়ে তার নষ্ট চোখ ঢেকে বলল, আম্মা বাড়িতে নাই।

ধনু শেখ বললেন, কই গেছে ?

ইমাম করিম সাহেবের বাড়িতে গেছেন।

করিম সাহেবের বাড়িতে কেন ?

উনার পরিবারের সাথে আমার ভাব হইছে। পেরায়ই ঐ বাড়িতে যায়।

তুমি তার সঙ্গে যাও নাই কেন ?

আম্মা আমারে নিয়া কোনোখানে যায় না।

ধনু শেখ বললেন, আতর রঙিলা বাড়িতে গিয়েছিল, এটা কি সত্য ?

সত্য না।

সত্য না হলে কেন আমার কানে এমন কথা আসছে ?

জানি না কেন আসছে।

তুমি ইমাম করিমের বাড়িতে যাও। আতরকে নিয়া আস।

জি আচ্ছা।

ধনু শেখ বললেন, জি আচ্ছা বলে দাঁড়ায়া আছ কেন! যাও।

হামিদা চলে গেল। ধনু শেখ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ হামিদা। সে ধনু শেখের জীবনে বড় ধরনের এক সমস্যা তৈরি করেছে। এই মেয়েটির চেহারা যত কুৎসিত তার কণ্ঠস্বর ততটাই মধুর। সে যখন কথা বলে ধনু শেখের শুনতে ভালো লাগে। ধনু শেখের মনে হয়, মেয়েটিকে পর্দার আড়ালে রেখে তিনি তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতে পারবেন। কেন এরকম মনে হয় তিনি নিজেও জানেন না। হামিদা কি কোনো তুকতাক করেছে ? সম্ভাবনা আছে। দাসীশ্রেণীর মেয়েরা তুকতাকে পারদর্শী। হামিদাকে বিদায় করে দেয়াটাই সবচে' ভালো বুদ্ধি। সমস্যা একটাই, আতর হামিদাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। অনেক রাত জেগে তার সঙ্গে গল্প করে। ধনু শেখ শুনেছেন, এমনও হয়েছে— গল্প করতে করতে তারা রাত পার করে দিয়েছে। এটাও কোনো ভালো কথা না। দাসীর সঙ্গে এত কী গল্প! দাসী হলো দাসী। আতরের বিয়ে হলে হামিদা আতরের সঙ্গে আতরের স্বশ্রববাড়িতে যাবে। হামিদার বাকি জীবন কাটবে সেখানে। আতরের স্বামী যদি চায় দাসীর গর্ভেও সন্তান জন্মাতে পারবে। সেই সন্তানরা কোনো সম্পত্তির অংশ পাবে না। বাবাকে বাবা ডাকতে পারবে না। তারা বাবার সংসারে কামলা খাটবে। এইটাই নিয়ম। অনেকে এই নিয়মে ভুল খুঁজে। ধনু শেখ কোনো ভুল দেখেন না। নিয়ম সমাজের ভালোর জন্য আসে। মন্দের জন্য আসে না।

আতর গল্প করছে শরিফার সঙ্গে। গল্পের বিষয়বস্তু রঙিলা নটিবাড়ি। আতর সেখানে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ছিল। সে কী দেখে এসেছে তারই গল্প। শরিফা বলল, তোমার খুবই সাহস।



আতর বলল, ঠিকই বলেছেন, আমার অনেক সাহস।

তোমার বাবা এই ঘটনা জানেন না?

না। আর জানলেই কী? উনি আমারে কি শাস্তি দিবে? আমারে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা উনার নাই। বাপজান আমারে ভয় পায়।

ভয় পায়?

হঁ। বাপজান ভাব দেখায় সে খুব সাহসী। আসলে ভীতু। বেজায় ভীতু।

শরিফা ইতস্তত করে বলল, রঙিলা বাড়িতে কী দেখলো?

আতর বলল, দিনেরবেলা গিয়েছিলাম। কিছুই দেখি নাই। সুন্দর সুন্দর মেয়ে— হাসতেছে, গল্প করতেছে। একজন আরেকজনের চুল বানতেছে।

ইমাম ইদরিস সাহেবের স্ত্রী জুলেখা না-কি রঙিলা বাড়িতে থাকেন? উনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না। উনি রঙিলা বাড়িতে থাকেন না। উনি কলিকাতা থাকেন। তাঁর গানের নতুন রেকর্ড হবে, এইজন্যে গিয়েছেন। আপনি কি রেকর্ডে উনার গান শুনেছেন? শুনি নাই। শুনতে ইচ্ছা করে।

আতর বলল, শুনতে ইচ্ছা করলে আমি শুনাব।

তোমার কাছে কি কলের গান আছে?

কলিকাতার বাড়িতে আছে। আমি আনাব।

কবে আনাবা?

খুব শিগগির আনাব। এখন আমি যাই।

আচ্ছা যাও, আবার আসবা।

আতর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করব। যদি মনে কিছু না নেন।

শরিফা বলল, মনে কিছু নিব না। যা ইচ্ছা জিজ্ঞাস কর।

আপনার স্বামী আপনাকে তালাক দিয়েছেন। তারপরেও আপনি স্বামীর ঘরে বাস করেন। এটা কেমন কথা?

শরিফা বলল, আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভাই আমারে রাখে নাই। আমার কোনোখানে যাওয়ার জায়গা নাই। ইমাম সাব আমারে আবার বিবাহ করতে রাজি হয়েছেন। উনি দয়া করেছেন।

বিবাহ কবে?

ধর্মে নিয়ম আছে উনি বিবাহ করার আগে আমারে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে হবে। এরে বলে 'হিল্লা' বিবাহ। আমারে কেউ হিল্লা বিবাহ করতে রাজি

না বইলা দেরি হইতেছে। তবে আমি একঘরে থাকলেও আলাদা থাকি। উনার সঙ্গে কথা বলি না। পর্দার মধ্যে থাকি। ভইন, আর কিছু জিজ্ঞাস করবা ?

না।

আতরের মন খারাপ হয়ে গেল। শরিফা হাসিখুশি মেয়ে, এখন কেমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। আতরের নিজেরও কাঁদতে ইচ্ছা করছে। এরকম তার প্রায়ই হয়। নিজের দুঃখে না, অন্যের দুঃখে তার কাঁদতে ইচ্ছা করে।

যে সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে হিন্দা বিবাহ কঠিন বিষয় ছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচারের যুগে ভারতবর্ষের মুসলমানরা কঠোরভাবে ধর্মের নিয়মকানুন পালন করতেন না। ধর্মকর্মে ঢিলাঢালা ভাব ছিল। অনেক হিন্দুয়ানী ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ভক্তিভরে দেবদেবীকে নমস্কার করতেন। তাদের কাছে পারলৌকিক এবং ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা জানাতেন। দেবদেবীদের নাম দিয়ে ছেলেমেয়েদের নামও রাখতেন। যেমন—

নারায়ণ শেখ  
গোকুল মোল্লা  
কালী বানু

মুসলমান মেয়েরা শাঁখা পরতেন, কপালে সিঁদুর দিতেন। মুসলমান বাড়িতে থাকত তুলসি মঞ্চ। সেখানে সাক্ষ্যপ্রদীপ জ্বালানো হতো।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি মৌলানা এনায়েত আলী এবং মৌলানা কেলামত আলি ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। তাদের ধর্ম প্রচার আন্দোলনের নাম ‘তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া’। এই নামের অর্থ— মোহাম্মদের পথ।

তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল ফরায়েজী আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূচনা করেন শরীয়তুল্লাহ। ফরায়েজী আন্দোলন মোহাম্মদ (দঃ)-এর শিক্ষার চেয়ে কোরানের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিল। তাদের মতে মুসলমানদের সব বাদ দিয়ে কোরানের ফরজ আঁকড়ে ধরতে হবে।

ফরায়েজী আন্দোলন এবং তার পরে পরে হানাফি মোস্তাহাবের কটরপন্থী আন্দোলনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সহজিয়া ভাব দূর হয়ে গেল।

তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহের ব্যাপারে কোরান শরীফ ‘হিন্দা বিবাহ’ উল্লেখ করেছে, কাজেই হিন্দা বিবাহ হতে হবে। এর মধ্যেও মনগড়া অনেক নিয়মকানুন তৈরি হয়ে গেল। যেমন, যিনি তাঁর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে আবার বিবাহ



করতে চান তিনি তার ইচ্ছার কথা জুমার নামাজের পর সমস্ত মুসল্লিদের জানাবেন। যাতে মুসল্লিদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই বিয়েতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। গোপনে কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়া যাবে না।

পবিত্র কোরান শরীফে এ জাতীয় কোনো নিয়মকানুন নেই। সূরা বাকারায় (আয়াত ২৩০) আল্লাহপাক বলছেন—

And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband. Then if he (the other husband) divorced her it is no sin for both of them that they come together again if they consider that they are able to observe the limits of Allah.

অনুবাদ : M Pickthall

তারপর যদি সে ঐ স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করেছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। তারপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দেয় তবে তাদের আবার মিলনে কারও কোনো দোষ নেই, যদি দুজনে ভাবে যে তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে।

অনুবাদ : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

এক জুম্মার নামাজে খুত্বা পাঠের পর ইমাম করিম শরিফার হিল্লা বিবাহের কথা বললেন। মুসল্লিদের মাঝে গুঞ্জন দেখা গেল। এ ধরনের ঘটনা বান্ধবপুরে এর আগে ঘটে নি। করিম বললেন, তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিজের বাড়িতেই আমি রেখেছি। বাধ্য হয়ে রেখেছি। তবে তার মুখ দর্শন করি না। সে আলাদা ঘরে থাকে। তার হিল্লা বিবাহের পর আমি ইনশাল্লাহ আবার তাকে বিবাহ করব। আমি একটা ভুল করেছি। আল্লাহপাকের কাছে ভুলের জন্যে ক্ষমা চাই। আমি আমার স্ত্রীকে খুব ভালো পাই। সে ভালো মেয়ে। এখন তার জন্যে আমার মন কান্দে।

কথা বলতে গিয়ে ইমাম করিমের গলা ভারী হয়ে গেল। তার চোখে পানিও এসে গেল। পাগড়ির কোণা দিয়ে তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, যদিও আল্লাহপাক তালাক বৈধ করেছেন, তারপরেও তাঁর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। অপছন্দের কাজ বলেই তিনি যেসব দম্পতি তালাকের পর পুনর্বিবাহ করতে চায় তাদের জন্যে শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। হিল্লা বিবাহ এইরকম এক শান্তি।

জুম্মাবার উপলক্ষে একজন মসজিদে খিচুড়ি সিনি দিয়েছিল। করিম সেই খিচুড়ি খানিকটা খেয়ে মসজিদে গুয়ে থাকলেন। বাড়িতে গেলেন না। ঠিক করলেন আছর, মাগরিব এবং এশার নামাজ শেষ করে বাড়িতে যাবেন। আজকাল বাড়িতে যাবার বিষয়ে তিনি আগ্রহ বোধ করেন না। যখন কাজকর্ম থাকে না তখন হাদিস কোরান পড়ে সময় কাটাতে চেষ্টা করেন। কোনো কিছুতেই মন বসে না। প্রচণ্ড অস্থিরতা বোধ করেন। অস্থিরতার কারণও তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট না। শরিফাই কারণ এটা ঠিক, তবে কোন অর্থে? শরিফাকে মাথা থেকে সম্পূর্ণ দূর করে তিনি দেশ থেকে আরেকটা মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারেন। এটাই করা উচিত। কিন্তু সেই মেয়ে তো শরিফার মতো হবে না। রং ঢং জানবে না। মজা করে কথা বলবে না। যদিও সারাক্ষণ হাসি মশকরা শোভন না।

ইমাম করিম সাহেব কি মসজিদে?

কে?

আমি ইদরিস।

কী চান?

দু'টা কথা বলব।

করিম বিরক্ত হয়ে বের হলেন।

কী বিষয়ে কথা বলতে চান?

তালাক বিষয়ে।

করিম বললেন, তালাক বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

ইদরিস বিনীত গলায় বললেন, হাফেজি পরীক্ষা দিতে আমি কিছুদিন দেওবন্দে ছিলাম। সেখানে বড় বড় আলেমদের তালাক বিষয়ে আলোচনা শুনেছি।

কী শুনেছেন?

নবীজির এক হাদিস আছে যেখানে তিনি বলেছেন, কেউ যদি পর পর তিনবার তালাক দেয় তা এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে। এক তালাকের পর ইদতকাল পার করতে হবে। ইদতের পর দ্বিতীয় তালাক আসতে হবে। তারপর আবার ইদতকাল পার করতে হবে। কাজেই আপনি যে তালাক দিয়েছেন তা হয় নাই। আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঘরসংসার করতে পারেন। তাকে হিল্লা বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

করিম বললেন, যে বিষয় জানেন না সে বিষয়ে কথা বলবেন না। অন্য মাজহাবের লোকজন এরকম কথাবার্তা বলে। আমরা হানাফি মাজহাবের। এই



মাজহাবে আমার তালাক বৈধ হয়েছে। আপনি কোরান শরীফ মুখস্থ করে এসে আছেন। জানেন না কিছুই।

ইদরিস বললেন, জি, কথা সত্য।

ধর্ম নিয়া আপনার কোনো কথাবার্তা বলাই উচিত না। আপনি বিবাহ করেছিলেন এক বেশ্যা মেয়েকে। শুনেছি আপনার যে মেয়ে হয়েছে সে না-কি দিনরাত হিন্দু দেবদেবীর নাম বলে।

ইদরিস বললেন, সে শুধু রাম বলে, আর কিছু না।

রামই বা কেন বলবে? যাই হোক, সেটা আপনার ব্যাপার। এখন বিদায় হন। ধর্ম হাদিস কোরান এইসব নিয়া আর কোনো দিন আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না।

মাওলানা ইদরিস মন খারাপ করে চলে এলেন। মীরার জন্যে তাকে এখন ভালো যত্নগার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। বান্ধবপুরের বাইরে থেকেও হিন্দু মেয়েরা মীরাকে দিয়ে শাঁখা সিঁদুর ছোঁয়াতে আসছে। মীরার ডান পা ডুবানো পানি খেলে না-কি অনেক অসুখ সারছে। বিশেষ করে এই পানি শূলবেদনায় অব্যর্থ। ভক্তজনের কাছে মীরার পা ভেজানো পানি বিতরণ করার দায়িত্ব শ্রীনাথ নিজের কাঁধে নিয়েছেন। এই পানি খাবার নিয়মও আছে। পূর্ণিমা এবং অমাবশ্যার রাত ছাড়া খাওয়া যাবে না। পানি খাবার পর আর কোনো খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না। এইসব নিয়মকানুন তিনি না-কি স্বপ্নে পেয়েছেন। স্বপ্নে সাদা কাপড়ে সমস্ত শরীর এবং মুখ ঢাকা এক মহিলা এসে বলেছেন, শ্রীনাথ, তুই আমার সেবায়েত। কেউ যদি পা ভেজানো পানি চায় তুই দিবি এবং রোজ একবার আমার কানে শাঁখের শব্দ শুনাবি। শ্রীনাথ কিছুদিন হলো শাঁখ বাজাতে শুরু করেছেন। যখন তখন বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠছে।

সন্ধ্যা মিলিয়েছে। লাবুস পুকুরঘাটে বসে আছে। আজ হঠাৎ শীত পড়েছে। উত্তরী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই হাওয়ার স্থানীয় নাম পাগলা হাওয়া। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গারো পাহাড় ডিঙিয়ে এই হাওয়া এসে শীত নামায়। কিছু সময়ের জন্যে মনে হয় শীতকাল। প্রকৃতি ভ্রান্তি তৈরি করে। লাবুস বসে আছে খালি গায়ে। অসময়ের শীত গায়ে লাগাতে তার ভালো লাগছে। লাবুসের সামনে হুকা। হুকায় তামাক পুড়ছে। লাবুস তামাক খায় না। হাদিস উদ্দিন তারপরেও নিয়ম করে হুকা জ্বালিয়ে লাবুসের সামনে রাখছে। হাদিস উদ্দিনের ধারণা কোনো একদিন মনের ভুলে ছোটকর্তা হুকার নলে টান দিয়ে বসবেন। আস্তে আস্তে অভ্যাস ধরে যাবে।

তার ওস্তাদ দরবার মিয়া আয়েশ করে তামাক খেতেন। গভীর রাতে হুকা টানার গুডুক গুডুক শব্দ শোনা যেত। সেই শব্দ আধো-ঘুম আধো-জাগরণে শোনার আনন্দই আলাদা। হাদিস উদ্দিন ছোটকর্তার কাছ থেকেও এটা আশা করে।

লাবুসের পাশের সিঁড়িতে শ্রীনাথ এসে বসলেন। হঠাৎ শীত নামায় তিনি কাবু হয়ে পড়েছেন। চাদর গায়ে দিয়েছেন। কানঢাকা টুপি পরেছেন। তারপরেও শীত যাচ্ছে না।

লাবুস বলল, কিছু বলবেন ?

শ্রীনাথ বললেন, একটা বিষয়ে আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। সকলের স্বার্থে আপনি আশা করি অনুমতি দিবেন। আমি একটা মন্দির দিতে চাই।

কী দিতে চান ?

মন্দির। মন্দিরের নাম মীরা মায়ের মন্দির।

ও আচ্ছা।

এই মন্দিরে কোনো মূর্তি থাকবে না। মীরা মায়ের ছবি থাকবে।

ও আচ্ছা।

আপনি কি অনুমতি দিয়েছেন ? আপনি অনুমতি না দিলেও মন্দির আমাকে দিতেই হবে। আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি। মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমাকে বলেছেন, আমি হেথায় হোথায় ঘুরে বেড়াই, আমার ভালো লাগে না। তুই আমার থাকার একটা জায়গা করে দে।

আপনি সত্যি স্বপ্নে দেখেছেন ?

অবশ্যই। যদি মিথ্যা বলে থাকি যেন আমার শরীরে কুষ্ঠ হয়। সারা অঙ্গ গলে গলে পড়ে।

লাবুস বলল, মিথ্যা আপনি বলেন নাই। সত্যি বলেছেন। এরকম স্বপ্ন আপনি দেখেছেন। মানুষ যা চিন্তা করে স্বপ্নে তাই আসে। স্বপ্নের কোনো মূল্য নাই। আমি আমার এখানে আপনাকে মন্দির বানাতে দিব না। মীরাকে নিয়ে যে ঝামেলা আপনি করছেন সেই ঝামেলাও আপনাকে আর করতে দিব না। মীরা আমার বোন। সৎ বোন। আমার যিনি মা, মীরারও তিনি মা। আপনি জানেন না ?

জানি।

লাবুস হঠাৎ খানিকটা উৎসাহিত হয়ে বলল, মন্দির আমি বানাতে না দিলেও আপনি কিন্তু মন্দির বানাবেন। বড় মন্দির, পাকা দালান। মন্দির বানানোর টাকা আপনি কোথায় পাবেন আমি জানি না। তবে বানাবেন।



শ্রীনাথ বললেন, কীভাবে জানলেন ?

আমি মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের কিছু জিনিস চোখের সামনে দেখি। কীভাবে দেখি জানি না, কিন্তু দেখি। আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। এখন যান।

শ্রীনাথ বললেন, মন্দির কবে নাগাদ বানাব ?

লাবুস বলল, দিন-তারিখ বলতে পারব না। আমি ঘটনা দেখি। দিন-তারিখ দেখি না।

শ্রীনাথ ইতস্তত করে বললেন, অন্য একটা বিষয়ে আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করব ?

করুন।

আপনাদের ধর্মে হিন্দা বিবাহ বলে একটা ব্যাপার আছে। সেই বিবাহ কি শুধু মুসলমানের সঙ্গে হতে হবে ? অন্য কোনো ধর্মের পুরুষের সঙ্গে হবে না ?

লাবুস বলল, আমি জানি না। নিয়ম থাকলে আপনি কি রাজি হতেন ?

শ্রীনাথ জিভে কামড় দিয়ে বললেন, রাম রাম! এটা কী বললেন ?

লাবুস বলল, আপনার মনে গোপন ইচ্ছা আছে বলেই বললাম। গোপন ইচ্ছা না থাকলে এরকম প্রশ্ন করতেন না। পুরুষমাত্রই লোভী। এখন আপনি আমার সামনে থেকে যান। আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন ?

না। আমি কারো উপর বিরক্ত হই না।

ইমাম করিম খেতে বসেছেন। তাকে খাবার দেয়া হয়েছে উঠানে। দরজার পাশে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শরিফা তদারকি করছে। ইমাম ডাকলেন, শরিফা।

শরিফা হাতের পাখা দিয়ে দরজায় বাড়ি দিল। এর অর্থ সে শুনছে। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ। তবে আকারে ইঙ্গিতে প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়। এতে দোষ হয় না।

করিম বললেন, আজ তোমার হিন্দা বিবাহের কথা প্রকাশ্যে বলেছি। মনে হয় অতি দ্রুত ব্যবস্থা হবে। এরপর আগের মতো সংসার করতে পারব। তোমার জন্যে সারাক্ষণ আমার মন কান্দে। তোমারে যে এতটা পছন্দ করতাম আগে বুঝি নাই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ ? ক্ষমা করলে পাখা দিয়া দুটা বাড়ি দেও।

শরিফা দু'টা বাড়ি না, সে ঠুক ঠুক করে ক্রমাগত বাড়ি দিয়েই যেতে লাগল। এর অর্থ কী করিম বুঝতে পারছে না। শরিফাকে দেখতে পেলে করিমের ভালো লাগত। শরিফার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

করিম বললেন, শরিফা কী বলতে চাও বুঝি না তো। মুখে কথা বলো। অসুবিধা নাই।

শরিফা চাপা গলায় বলল, আমি হিল্লা বিবাহ করব না।

চাও কী তুমি ?

আপনারে নিয়া দূরদেশে পালায়া যাব। যেখানে কেউ আমারে চিনব না। আমি যে আপনার তালুকি বউ কেউ জানব না।

কোন দূরদেশে যাইতে চাও ?

আসাম।

করিম ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আসামে গেলে কেউ জানব না তা ঠিক আছে। কিন্তু আল্লাহপাক তো জানবেন। না-কি তোমার ধারণা উনিও জানবেন না ?

শরিফা চুপ করে গেল। করিম অনেক রাত পর্যন্ত তার ফোঁপানো শুনল।





৩০ জুলাই ১৯৪১ সন। সকাল ন'টা। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা ভালো না। তিনি অসহায় এবং অস্থির বোধ করছেন। তাঁকে বড় বড় ডাক্তাররা ঘিরে আছেন। বিধান রায় এসেছেন, নীলরতন সরকার এসেছেন। বিখ্যাত শৈলচিকিৎসক মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন।

মোহনলাল একটা অপারেশন করতে চাচ্ছেন। তিনি নিশ্চিত যে, অপারেশন কবির জন্য মঙ্গলজনক হবে।

বিধান রায় রাজি না। তিনি বলছেন, আমার মন সায় দিচ্ছে না।

মোহনলাল বললেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান মন দিয়ে চলে না। অপারেশন না করা ভুল হবে।

বিধান রায় তারপরেও জেদির মতো বলছেন, না।

রবীন্দ্রনাথ ইশারা করলেন যেন একজন কেউ খাতা-কলম নিয়ে বসে। তাঁর মাথায় কবিতা এসেছে। নিজের হাতে লেখার সামর্থ্য নেই। তিনি মুখে মুখে বলবেন, কেউ একজন লিখবে। তিনি ক্ষীণ স্বরে লাইনগুলি বলছেন। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করছেন, যেন শ্রুতিলিখনে ত্রুটি না হয়। এমন হতে পারে যে, তিনি শুদ্ধ করার সময় পাবেন না। জীবনের সর্বশেষ রচনায় ভুল থেকে যাবে।

### তোমার সৃষ্টির পথ

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি  
বিচিত্র ছলনাজালে  
হে ছলনাময়ী!  
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে  
সরল জীবনে!  
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত;  
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিষ্ক তारे  
যে পথ দেখায়  
সে যে তার অন্তরের পথ,  
সে যে চিরস্বচ্ছ,  
সহজ বিশ্বাসে সে যে  
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।  
বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু  
এই নিয়ে তাহার গৌরব।  
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।  
সত্যেরে সে পায়  
আপন আলোকে-ধৌত অন্তরে অন্তরে।  
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,  
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে  
আপন ভাণ্ডারে।  
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে  
সে পায় তোমার হাতে  
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশন করলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই অপারেশন হলো। রবীন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করলেন, আর খুললেন না। ২২শে শ্রাবণ দুপুর বারোটা দশ মিনিটে তিনি এমন এক ভুবনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন যে ভুবনকে তিনি তাঁর রচনায় গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতিকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন একশ' বছর। তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশ নামের যে রাষ্ট্রের জন্ম হলো সেই রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতটিও তাঁর রচনা।





ধনু শেখ পালকি নিয়ে পাখি শিকারে বের হয়েছেন। হাওরে শীতের হাঁস নেমেছে। দেশান্তরী পাখির মাংস তিনি খান না। বহুদূর দেশ থেকে উড়ে আসে বলে এদের পাখা শক্ত, মাংসও শক্ত। মাংসে বালি বালি স্বাদ বলে এইসব বিদেশী পাখির আরেক নাম বালিহাঁস। এত ঝামেলা করে বালি খাওয়ার কোনো মানে হয় না। ধনু শেখ হরিয়াল শিকারে বের হয়েছেন। হরিয়াল ঘুঘু সাইজের পাখি। গায়ের রঙ সবুজ মেশানো হলুদ। এই পাখি বটগাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। বটফল খায়। অন্যসব পাখি মাছ খায়, শামুক ঝিনুক খায়। হরিয়ালের খাদ্য ফল বলেই এর মাংস অতি সুস্বাদু। মাখনের মতো নরম।

ধনু শেখের সঙ্গে যাচ্ছেন ইমাম করিম। গুলিবিদ্ধ পাখিকে তিনি 'আল্লাহ আকবর' বলে জবেহ করবেন, তখনি শুধু মাংস হালাল হবে।

পালকির দরজা খোলা। ইমাম দরজার পাশে আছেন। ধনু শেখ গল্প করছেন। ইমামকে হ্যাঁ হুঁ দিতে হচ্ছে। বড় মানুষদের সঙ্গে গল্পগুজবের কিছু নেই। বড় মানুষরা গল্প করবেন অন্যরা শুধু হুঁ দিবে। ধনু শেখের গন্তব্য তিন বটের মাঠ। বান্ধবপুর থেকে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে। যেতে সময় লাগে। তিন বটের মাঠে বটগাছের সংখ্যা কিন্তু তিন না, চার। এই চার বটগাছ চক্রাকারে বড় হয়েছে। অতি দর্শনীয় ব্যাপার।

ধনু শেখ বললেন, বটগাছের সংখ্যা চার। কিন্তু নাম তিনবটের মাঠ। কারণ কী ইমাম?

করিম বলল, জানি না জনাব।

ধনু শেখ বললেন, জগতের বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর একটাই— জানি না। আফসোস। তুমি কখনো তিনবটের মাঠে গিয়েছ?

জি-না।

বড়ই সৌন্দর্য। ভাদ্র মাসে সেই মাঠে হাওরের পানি উঠে। চারটা বটগাছের মাথা শুধু দেখা যায়। আর কিছু না। এই দৃশ্য একবার যে দেখবে সে ভুলবে না। পানির উপরে বটগাছের মাথা। সেই মাথায় কিচিরমিচির করছে হরিয়াল। এক গাছ থেকে উড়ে অন্যগাছে বসছে। মনে হয় বেহেশতেও এত সুন্দর দৃশ্য নাই।

করিম বললেন, বেহেশতের সৌন্দর্য বুঝার ক্ষমতা মানুষের নাই জনাব।  
পৃথিবীর সৌন্দর্য একরকম, বেহেশতের সৌন্দর্য অন্যরকম।

তাও ঠিক। বেহেশতে তো যেতে পারব না। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর তা  
দেখাই আমার জন্যে যথেষ্ট। এখন বলো, তোমাকে এত চিন্তাযুক্ত লাগছে কেন?  
করিম জবাব দিল না।

ধনু শেখ বললেন, মনে ফুটি রাখা আমাদের কর্তব্য। মাসে কমপক্ষে একবার  
রক্ত দর্শন করলে মনে ফুটি আসে। মেয়েছেলেদের মনে ফুটি থাকে বেশি, কারণ  
তারা প্রতি মাসে একবার রক্ত দেখে। আমাদের পুরুষদের এই সুবিধা নাই বিধায়  
আমাদের পশুপাখি শিকার করতে হয়। পশুপাখির রক্ত দেখতে হয়। বুঝেছ?

জি।

তোমার স্ত্রীর হিল্লা বিবাহের কিছু কি হয়েছে?

এখনো হয় নাই।

কিছুই বুঝলাম না! কেন কেউ আগায়া আসতেছে না? শুনেছি তোমার স্ত্রী  
রূপবতী, বয়সও অল্প।

করিম জবাব দিলেন না। ধনু শেখ বললেন, মন দিয়া শোন কী বলি। আমি  
এক রাতের বিবাহে রাজি আছি। তোমার একটা উপকার হবে এইজন্যেই রাজি।  
এই বিবাহ হৈচৈ আমোদ-ফুটির বিবাহ না। একরাতের মামলা। বিবাহ তো তুমি  
নিজেই পড়াতে পার। ঠিক না?

জি।

পাখি শিকারের পর পালকি নিয়া তোমার বাড়িতে যাব। তুমি বিবাহ পড়াবে।  
পালকিতে বউ নিয়া আমি আমার ঘরে যাব। পরের দিন সকালে পালকি দিয়া  
কন্যা তালাক দিয়া ফেরত পাঠাব। তুমি নিজের স্ত্রী ফেরত পাইবা। সুখে  
ঘরসংসার করবা। ঠিক আছে?

করিম জবাব দিল না। হরিয়াল শিকারে ধনু শেখ কেন তাকে নিয়ে এসেছেন  
তা এখন স্পষ্ট হয়েছে। ধনু শেখ বললেন, চুপ করে আছ কেন বুঝলাম না। এমন  
কোনো নিয়ম কি আছে যে যার সঙ্গে হিল্লা বিবাহ হবে তার ঠ্যাং থাকতে হবে?  
লুলা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হবে না।

এরকম কোনো নিয়ম নাই।

তাহলে তো তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মুখ ভোঁতা করে রাখছ  
কেন? হাসো। স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হবে এইজন্যে মন খারাপ? এক  
রাতের মামলা।



তিনবটের মাঠের বটগাছ দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। চারদিকে খোলা প্রান্তর, মাঝখানে হঠাৎ ঝড়ি নামানো চারটা বিশাল বটগাছ। হরিয়াল পাখির ঝাঁক এক গাছ থেকে আরেক গাছে যাচ্ছে, এই দৃশ্য এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

ধনু শেখ বললেন, আমি শুনেছি বিসমিল্লাহ বলে যদি গুলি করে পাখি মারা হয় তাহলে সেই পাখি হালাল।

ভুল শুনেছেন। পশুপাখি শিকার কিংবা যুদ্ধের গুরু বিসমিল্লাহ বলে করা যাবে না।

তাহলে যুদ্ধ গুরু করব কীভাবে?

তখন বলতে হবে ‘আল্লাহ আকবর’। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।

ধনু শেখ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, তুমি কি তাবিজকবচ দিতে পার? যদি পার আমার মেয়ে আতরকে একটা তাবিজ দিবা। তার ঘুরাফিরা রোগ হয়েছে। এইখানে ওইখানে ঘুরে। কোনো একদিন জিন-ভূতের নজরে পড়বে। আমি অস্থির থাকি।

আমগাছের নিচে শিবশংকর বসে আছে। তার সামনে আতর। আতরের হাতে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে বড়ই ভর্তা। টেঁকিতে বড়ই কুটে ঝাল কাঁচামরিচ দিয়ে তাকে এই ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে হামিদা। ভর্তাটা খেতে এতই ভালো হয়েছে যে শিবশংকরের জন্যে খানিকটা নিয়ে এসেছে। আতর নিশ্চিত ভোরবেলায় আমগাছের কাছে এলেই শিবশংকরের দেখা পাওয়া যাবে।

শিবশংকর বলল, আমি বড়ই ভর্তা, আম ভর্তা এইসব খাই না।

আতর বলল, খান না কেন?

ঝাল দেয়া হয় এইজন্যে খাই না। আমি কাঁচামরিচ খেতে পারি না।

আশ্চর্য তো!

আশ্চর্যের কিছু নাই। অনেকেই অনেক কিছু খেতে পারে না। তুমি কি জানো ভারতবর্ষে কাঁচামরিচ ছিল না?

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। তারা তরকারি ঝাল করত আদা দিয়ে আর গোলমরিচ দিয়ে।

কাঁচামরিচ কোথেকে এসেছে?

পর্তুগীজরা নিয়ে এসেছে। শুধু কাঁচামরিচ না, তারা আলু এনেছে। এই দেশে আগে আলু ছিল না। তুমি আলু খাও?

হঁ। তবে আমার পছন্দ কাঁঠালের বিচি। আচ্ছা, কাঁঠালও কি পর্তুগীজরা এনেছে?

না।

আতর ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ইশ কাঁঠাল যে কেন পর্তুগীজরা আনল না!

শিবশংকর বিস্মিত হয়ে বলল, পর্তুগীজরা কাঁঠাল আনলে কী হতো?

আতর বলল, আমার ভালো লাগত।

কেন?

জানি না কেন।

শিবশংকর বলল, এক টুকরা কাগজ আর একটা কলম হাতের কাছে থাকলে তোমাকে মজার একটা জিনিস দেখাতাম।

আতর চোখ উজ্জ্বল করে বলল, কী দেখাতেন?

প্রমাণ করতাম যে, এক সমান দুই।

এক সমান দুই হবে কেমনে?

এখানেই তো মজা।

আতর বলল, আমি একটা কাঠি নিয়ে আসি, আপনি মাটিতে লিখে দেখান।

আতর কঞ্চি নিয়ে এসেছে। শিবশংকরের পাশে উবু হয়ে বসেছে। শিবশংকর উৎসাহ নিয়ে আঁকাআঁকি করছে। আতর দেখছে মুগ্ধচোখে।

মনে কর,

$$x = y$$

এখন আমি উভয়পক্ষকে  $y$  দিয়ে গুণ করলাম। তাহলে কী হবে?

$$xy = y^2$$

এখন আমি উভয়পক্ষ থেকে  $x^2$  বাদ দিলাম। তাহলে কী হবে?

$$xy - x^2 = y^2 - x^2$$

এসো এখন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি। তাহলে কী হবে?

$$x(y-x) = (y-x)(y+x)$$

এখন উভয়পক্ষকে  $(y-x)$  দিয়ে ভাগ দেব।

$$\frac{x(y-x)}{(y-x)} = \frac{(y-x)(y+x)}{(y-x)}$$

কাটাকুটি করার পর কী থাকবে?

$$x = y+x$$

যেহেতু  $y$  এবং  $x$  সমান

$$x = x+x$$

$$x = 2x$$



এখন x দিয়ে ভাগ দিলে হবে

$$1 = 2$$

শিবশংকর আনন্দিত গলায় বলল, আতর, বুঝতে পেরেছ ? এক সমান দুই  
যে প্রমাণ করলাম।

আতর বলল, না।

খুব সহজ অংক, তুমি বুঝতে পারলে না কেন ?

বুঝতে না পারলে আমি কী করব ?

তোমার তো বুদ্ধি কম।

আতর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনারও বুদ্ধি কম।

শিবশংকর বলল, কেন বলছ আমার বুদ্ধি কম ?

আপনি কাঁচামরিচ খান না এইজন্যে আপনার বুদ্ধি কম। যারা কাঁচামরিচ খায়  
না তাদের বুদ্ধি কম হয়।

কে বলেছে ?

এটা সবাই জানে। আপনার বুদ্ধি কম এইজন্যে আপনি জানেন না। আপনি  
প্রমাণ করেছেন এক সমান দুই। আমি প্রমাণ করব আপনার বুদ্ধি নাই। করব ?

কর।

একটা পাখির নাম বলেন যার ঠ্যাং তিনটা।

এরকম পাখি সত্যিই আছে ?

আছে।

এ দেশের পাখি ?

হঁ।

তুমি নিজে দেখেছ ?

হঁ।

আমি জানি না।

আতর বলল, প্রমাণ হয়েছে না আপনার বুদ্ধি কম ?

পাখিটার নাম বলো।

আপনি অনুসন্ধান করে বের করেন।

আতর চলে যাচ্ছে। শিবশংকর মন খারাপ করে তাকিয়ে আছে। তার খুব  
ইচ্ছা করছে আতরকে বলে, তুমি যে পাখির কথা বলেছ সেই পাখি আসলে নাই।  
তারপরেও ধরে নিলাম এরকম পাখি আছে। ধরে নিলাম আমি বোকা। তুমি চলে

যেও না। আরো কিছুক্ষণ থাক। আমার সঙ্গে গল্প কর। আমি অনেক মজার মজার জিনিস জানি। সব তোমাকে বলব।

ধনু শেখ শরিফাকে বিবাহ করে স্ত্রী নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। শরিফা জড়সড় হয়ে আছে। অকারণে চমকে চমকে উঠছে। আতর তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করছে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছে। সহজ স্বাভাবিক গলায় বলেছে, কলিকাতা থেকে কলের গান আনায়েছি। আপনি কি গান শুনবেন? জুলেখার একটা থাল আছে। একপিঠে উনার গান, অন্যপিঠে কৃষ্ণভানুর গান।

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, গান শুনব না।

আতর বলল, কাঁপতেছেন কেন?

শরিফা বলল, ভয়ে কাঁপতেছি। খুব ভয় লাগতেছে আতর।

আতর সহজ গলায় বলল, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছেন, একজীবনে অনেকবার ভয় পাবেন। মেয়ে হয়ে জন্মানোর এটা শাস্তি।

ধনু শেখ প্রচুর মদ্যপান করে এক রাতের স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমুতে গেলেন। জড়ানো গলায় বললেন, বৌ শরিফা, তুমি বড়ই ভাগ্যবতী। ঠ্যাংওয়ালা স্বামীর সঙ্গে সংসার করলা, আবার ঠ্যাং ছাড়া স্বামীর সাথেও সংসার করলা। হা হা হা। শরিফা আতঙ্কে এবং ভয়ে শিউরে উঠল।

ফজরের নামাজ পড়েই করিম ধনু শেখের বাড়িতে চলে এসেছে। ধনু শেখ ঘুম থেকে উঠলেন দুপুরবেলায়। করিমকে বাংলাঘরে ডেকে পাঠালেন। দরাজ গলায় বললেন, প্রচুর মদ্যপান করে রাতে গুয়েছি। গুয়েই ঘুম। স্ত্রীর সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা, আদর-সোহাগ কিছুই হয় নাই। কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ আর তালাক দিব না। তালাক ফালাক যা হবার কিছুদিন পরে হবে।

করিম বলল, এসব কী বলেন?

ধনু শেখ গলা উঁচিয়ে বললেন, কী বলি মানে? তোমার সঙ্গে কি দলিল করেছি যে একদিন পরে স্ত্রী তালাক দিব? বলো কোনো দলিল করেছি?

করিম হতভম্ব গলায় বলল, আমি শরিফার সঙ্গে কথা বলব।

ধনু শেখ বললেন, অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাও, এটা কেমন কথা? পর্দাপুষিদা বিস্মরণ হয়েছ? যাও বিদায় হও। অনেক ত্যক্ত করেছ, আর না।

ধনু শেখ বাংলাঘর ছেড়ে অন্দরের দিকে রওনা দিলেন। তাঁকে উৎফুল্ল এবং আনন্দিত মনে হচ্ছে। পাখির মাংস রাতে খাওয়া হয় নি। রৈঁধে রাখা হয়েছে।



পাখির মাংস বাসি করে খাওয়া নিয়ম। এখন লুচি এবং পাখির মাংস দিয়ে নাশতা করবেন এটা ভেবেও ভালো লাগছে। স্ত্রীর জন্যে শাড়ি গয়নার ব্যবস্থা করতে হবে। নয়া বৌ'র ফকিরনীর মতো বেশভূষা থাকবে কেন? গলা হাত খালি দেখতেও খারাপ। নেত্রকোনায় লোক পাঠানো দরকার, লাল শাড়ি কিনে আনবে। বৌ মানুষকে লাল শাড়ি ছাড়া মানায় না।

গত দু'দিন ধরে মীরা চুপচাপ। তার মুখে রামনাম নেই। সে কোনো শব্দও করছে না। শ্রীনাথ বিব্রত অবস্থায় আছেন। মীরাকে দেখতে আসা দর্শনার্থীদের বলছেন, মা কুপিত হয়েছেন। কারো ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

নয়া বাজার থেকে বড় বাড়ির এক বৌ এসেছে মীরাকে দিয়ে কপালে সিঁদুর দেয়াতে। বৌটির নাম সরজুবালা। বারবার তার গর্ভ নষ্ট হচ্ছে। যদি মীরাকে দিয়ে সিঁদুর দেয়ালে গর্ভ রক্ষা হয়। মীরার হাতে সিঁদুরের কৌটা দেয়া মাত্র সে কৌটা দূরে ফেলে দিল। শ্রীনাথ হাহাকার করে উঠলেন, যা ভেবেছি তাই। দেবী কুপিত। পূজার ব্যবস্থা করতে হবে। দেবীর রাগ কমাতে হবে। সরজুবালা নামের বৌটি কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

মীরার দর্শনার্থীদের মধ্যে একজন পুরুষ— এককড়ি সাহা। যুদ্ধের কারণে তাঁর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। চালের দাম এতটা বাড়বে তিনি চিন্তাও করেন নি। বার্মা থেকে চাল আসা বন্ধ এটা ঠিক। দেশের চাল গেল কোথায়? এককড়ি খবর পেয়েছেন কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ভুখা মানুষের না-কি ঢল নেমেছে। তারা ভাত চায় না। তাদের একটাই আকুতি— একটু ফ্যান দেন। অবস্থা যদিকে যাচ্ছে তাতে মনে হয় না ফ্যানও পাওয়া যাবে। ঘরে ভাত রান্না হলে তবেই না ফ্যান হবে।

এককড়ি চাল ভালোই মজুদ করেছেন। বাড়ির একটি গোলা আগেই পূর্ণ করেছেন। তাড়াহুড়া করে বানানো দ্বিতীয় গোলাটিও পূর্ণ। ঠিক কত চাল আছে হিসাব না থাকলেও পাঁচশ মণের বেশি ছাড়া কম হবে না। এককড়ি এখন ঝুঁকেছেন কেরোসিন, সাবান এইসবের দিকে। অভাব আসে মিছিল করে। চালের অভাবের সঙ্গে এখন যুক্ত হবে অন্য অভাব। তেল, সাবান, কাপড় কিছুই পাওয়া যাবে না। নুনের মতো সামান্য জিনিসও না। ব্যবসার এমন সুযোগ সব সময় আসে না। সুযোগ হঠাৎ হঠাৎ আসে। সুযোগের ব্যবহার করতে হয়। এককড়ি সুযোগের ব্যবহার করছেন। কোলকাতার ছোটবাজারে তাঁর দোকান আছে। সেখানে চাল এবং কাপড় মজুদ করেছেন। বিশ্বাসী লোকজন সেই দোকান দেখছে। তারপরেও এককড়ি দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। রাতে ভালো ঘুম

হয় না। চোখ বন্ধ হলেই নানান দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে। স্বপ্নগুলির কোনো আগামাথা নাই।

একরাতে স্বপ্ন দেখলেন কোলকাতার ছোটবাজারের কাপড়ের গুদাম লুট হয়েছে। শত শত মানুষ কাপড় নিয়ে নিচ্ছে। তারা সবাই নগ্ন, কিন্তু কেউ কাপড় গায়ে দিচ্ছে না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এককড়ি হতভম্ব হয়ে বললেন, এই তোমরা করছ কী? তারা বলল, হুদা কাপড় খাইতে পারি না গো। লবণ দেন, লবণ দিয়া খাই। স্বপ্নে অস্বাভাবিক ব্যাপার খুবই স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। তিনি এক ধামা লবণ এনে তাদের সামনে রাখলেন। তারা সবাই লবণের ধামার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বপ্নের পরের অংশ আরো ভয়াবহ। এক চশমা পরা বুড়ো লবণ মাখিয়ে এককড়ির গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া শুরু করল। এককড়ি দৌড়ে পালাতে গেলেন, শত শত মানুষ তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করল। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাত আর চোখের পাতা এক করতে পারলেন না।

এ ধরনের বিকট স্বপ্ন প্রতি রাতে দেখলে মন দুর্বল হয়। এককড়ির বেলাতে তাই ঘটেছে। তিনি ঠিক করেছেন রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। মন্দিরে রোজ পূজা হবে। এই দুই দেবদেবী তাঁকে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তিনি এসেছেন বিষয়টা নিয়ে শ্রীনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে। মীরার জন্যে তিনি রূপার পায়ের মল নিয়ে এসেছেন। লোকজন বলাবলি করেছে— এই মেয়েতে দেবী প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনা যদি সত্যি সেরকম হয় তাহলে ছোট দেবীকে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন।

এককড়ি শ্রীনাথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, তোমাকে একটা কাজ দিব শ্রীনাথ।

শ্রীনাথ জোড়হস্ত হয়ে বলল, ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ তো আমারে দিয়ে হবে না কর্তা। নিষেধ আছে।

নিষেধ কে করেছে?

বললে বিশ্বাস করবেন না। এইজন্যে বলব না।

এককড়ি বললেন, বিশ্বাস যাব না কেন? তুমি অনেক দিনের বিশ্বাসী মানুষ।

শ্রীনাথ চাপা গলায় বলল, দেবী সীতা স্বয়ং বলেছেন। তিনি বলেছেন, দিনরাত রাম-সীতা নাম জপবি। অন্যকিছু মনে স্থান দিবি না। এখন তাই করি।

এই বিষয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলব। আমি মন্দির বানাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মন্দিরে দিনরাত নামজপ হবে। তোমার পরামর্শ দরকার।

মন্দির কার হবে? রামমন্দির হলে বিবেচনা করতে পারি।

আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব। আগে আলোচনা পরে সিদ্ধান্ত।



এককড়ি ফিরে যাবার আগে লাবুসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। লাবুস এখন অঞ্চলের বিশিষ্টজন। বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হয়।

লাবুস শ্বেতপাথরের ঘাটে বসে ছিল। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ আগে পাঁচটা বিমান পাখির মতো ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেছে। সবার সামনে একটা, বাকি চারটা পেছনে। মানুষ শুধু যে পাখির মতো উড়তে শিখেছে তা-না, পাখির স্বভাবও আয়ত্ত্ব করেছে।

লাবুস, ভালো আছেন? আমাকে চিনেছেন? আমি এককড়ি।

আপনাকে চিনেছি। বসুন। তামাক খেলে খান। হাদিস উদ্দিন রোজ আমাকে তামাক বানিয়ে দিয়ে যায়। আমি খাই না। তারপরেও দেয়। আপনি ইচ্ছা করলে খেতে পারেন। আমি নলে মুখ দেই নাই।

এককড়ি বললেন, নলে মুখ দিলেও অসুবিধা নাই। মহাবিপদে কোনো হিন্দু মুসলমান নাই। সব সমান। দেশের এখন মহাবিপদ। চূড়ান্ত অভাব। শুনেছি কলিকাতার রাস্তায় এখন ফ্যানের জন্যে মিছিল। আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন?

আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না।

আমি জানি। আমার কাছে কাগজ আসে। কলিকাতা সমাচার। আপনি যদি চান কাগজ পড়ার পর আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব।

লাবুস বলল, পাঠাতে হবে না।

এককড়ি তামাক টানতে টানতে বললেন, ঠিকই বলেছেন, খারাপ সংবাদ যত কম জানা যায় ততই ভালো। এদিকে রাশিয়া তো শেষ। হিটলার স্টালিনগ্রাদ দখল করে বসে আছে। স্টালিনগ্রাদ দখল মানে রাশিয়া দখল। নাম শুনেছেন স্টালিনগ্রাদের?

জি-না।

বিরাট শহর। রাশিয়ার কলিজা। হিটলার সেই কলিজা চাবায়ে খেয়ে ফেলেছে। বাপকা ব্যাটা। রাশিয়ার যিনি প্রধান তাঁর নাম স্টালিন। হিটলারের নাম শুনেই তিনি এখন মুতে দিচ্ছেন। দিনের মধ্যে কয়েকবার তার কাপড় নষ্ট হয়।

ও আচ্ছা।

এদিকে আবার মরুভূমির শিয়াল শুরু করেছে হক্ক হুয়া।

বুঝলাম না।

হিটলারের সেনাপতি রুমেলকে আদর করে সবাই ডাকে মরুভূমির শিয়াল। শিয়ালের মতো বুদ্ধি, এই কারণে শিয়াল ডাকে। সে আফ্রিকা খেয়ে ফেলেছে। চার পাঁচ মাসের মামলা, দেখবেন সারা পৃথিবী চলে যাবে হিটলার বাবাজির দখলে।

লাবুস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, যাবে না।

এককড়ি বললেন, কী বললেন?

হিটলার পরাজিত হবে।

আপনাকে কে বলেছে?

লাবুস চুপ করে রইল। তাকে কেউ কিছু বলে নাই। কিন্তু সে জানে। কীভাবে জানে সেটা এক রহস্য। এই রহস্য নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করা দরকার। কার সঙ্গে আলাপ করবে?

এককড়ি দুই দফা তামাক খেয়ে হুটচিঙে বিদায় নিলেন। আজ তাঁর মন ভালো। মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। রাধাকৃষ্ণের মন্দির বানাবেন। রামমন্দিরে তাঁর পুষবে না। রাম কোনো কাজের দেবতা না। দুর্বল দেবতা। যে তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারে না সে দেবতাদের মধ্যেই পড়ে না। মন্দিরের পেছনে একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা বের হয়ে যাবে। তা যাক। মন্দিরের জন্যে দেবদেবী তাঁকে রক্ষা করবেন। সবার রক্ষাকর্তা দরকার। ইউরোপের রক্ষাকর্তা হিটলার। তাঁর রক্ষাকর্তা রাধাকৃষ্ণ। তিনি ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

সন্ধ্যা অনেক আগে মিলিয়েছে। পুকুর থেকে ধোঁয়ার মতো বোনকা দিয়ে কুয়াশা উঠছে। লাবুস আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে। হঠাৎ হঠাৎ কিছু দৃশ্য খুব মনে লেগে যায়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

মাগুলানা ইদরিস মেয়েকে কোলে নিয়ে পুকুরঘাটে এসে বসলেন। লাবুস বলল, কিছু কি বলবেন?

ইদরিস বললেন, আমি কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাব। তোমার বোনকে দেখেগুনে রাখবে।

লাবুস বলল, অবশ্যই রাখব। আপনি কোথায় যাবেন?

বগুড়া যাব। মহাস্থান বলে একটা জায়গা। তুমি কি আমাকে হাতখরচ দিতে পারবা?

পারব।

জমিদার শশাংক পালের কাছে আমি একটা ওয়াদা করেছিলাম। ওয়াদা রক্ষা করতে যাব। কী ওয়াদা জানতে চাও?

না।

তোমার বিষয়ে হাদিস উদ্দিন কিছু অদ্ভুত কথা বলেছে।



কী কথা ?

সে একদিন সন্ধ্যায় দেখে পুকুরঘাটে দুইজন লাবুস বসে আছে।

লাবুস সহজ গলায় বলল, মানুষ অদ্ভুত কথা বলতে পছন্দ করে। সাধারণ জীবন তার পছন্দ না। এর মধ্যেও সে রহস্য নিয়ে আসতে চায় বলেই এইসব বলে।

ইদরিস বললেন, রহস্য সে কেন আনতে চায় ?

লাবুস বলল, যে জিনিস নাই তার জন্যে মানুষ থাকে ব্যস্ত। রহস্য বলে কিছু নাই, কিন্তু মানুষ রহস্য বিশ্বাস করে।

ইদরিস বলল, রহস্য নাই কথাটা ঠিক বলনা না। মেরাজের সময় আল্লাহপাকের সঙ্গে নবীজির সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয় তার ষাটভাগ জাহেরী। চল্লিশভাগ বাতেনী। অর্থাৎ রহস্যের কথা।

লাবুস বলল, পুষ্পরানিকে নিয়া ভিতরে যান। তার ঠান্ডা লাগবে।

ইদরিস উঠে দাঁড়ালেন। লাবুস বলল, বগুড়া থেকে ফিরে আপনি অদ্ভুত একটা বিষয় দেখবেন। খুবই আনন্দ পাবেন।

ইদরিস অবাক হয়ে বললেন, কী দেখব ?

লাবুস বলল, আপনি দেখবেন পুষ্পরানি কথা বলা শুরু করেছে। সে দিনরাত কথা বলবে।

তুমি জানো কীভাবে ?

লাবুস হাসতে হাসতে বলল, এটা একটা বাতেনী কথা।

ধনু শেখ আজ মদ্যপান করেন নি। মদ্যপান করলে মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। ঘুম পায়। নয়া স্ত্রী পাশে নিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে হয়। আজ রাতে তিনি এই সমস্যার ভেতর দিয়ে যাবেন না। ধনু শেখ বাংলাঘরে তামাক খাচ্ছেন। অতিরিক্ত জর্দা দিয়ে পান খাবার কারণে মাথা ঘুরছে। তিনি মাথার ঘূর্ণন কমানোর জন্যে অপেক্ষা করছেন। শরীরটা সুস্থ হলেই তিনি শোবার ঘরে যাবেন। শরিফাকে ডাকবেন। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নেবার জন্যে ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। কোলকাতার কারিগরকে দিয়ে গদিমোড়া চাক্কাওয়ালা চেয়ার বানানো হয়েছে।

ধনু শেখের মেজাজ বেশ খারাপ। তিনি খবর পেয়েছেন ইমাম করিম তাঁর বাড়ির সামনের কদম গাছের নিচে বিকাল থেকে বসে আছে। এখন রাত বাজে দশটা। হারামজাদা এখনো আছে। করিমকে তিনি ডেকে পাঠাবেন না-কি পাঠাবেন না এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। দেখা হলে অতিরিক্ত রাগারাগি

করে ফেলতে পারেন। কবিরাজ আশু ভট্টাচার্য তাঁকে রাগারাগি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর মাথার রগ না-কি দুর্বল হয়ে গেছে। বেশি রাগারাগি করলে রগ ছিঁড়ে মৃত্যুও হতে পারে।

ধনু শেখ মনে মনে তিনবার বললেন, আমি কোনো রাগারাগি করব না। আমি কোনো রাগারাগি করব না। আমি কোনো রাগারাগি করব না। তিন প্রতিজ্ঞার পর ধনু শেখ করিমকে ডেকে পাঠালেন।

কালো চাদর গায়ে দিয়ে করিম দাঁড়িয়ে আছে। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তার চোখ ডেবে গেছে। চোখের কোণে কালি। চোখ টকটকে লাল।

ধনু শেখ বললেন, শুনলাম সন্ধ্যা থেকে তুমি কদম গাছের গোড়ায় বসে আছ ?  
জি।

মসজিদের মাগরিবের নামাজ পড়ায়েছ ?

না।

এশার নামাজ পড়ায়েছ ?

না।

তোমার ইমামের চাকরি আমি নট করে দিলাম। মসজিদের জন্যে নতুন ইমাম আসবে।

করিম বলল, জনাব, শরিফার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিলেন ?

ধনু শেখ হুকায় লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমার কোনো পুত্রসন্তান নাই। মন বলতেছে এইবার পুত্রসন্তান হবে। পুত্রসন্তান না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নাই।

বুঝলাম না। আপনি হিল্লা বিবাহ করেছেন।

হিল্লা ফিল্লা বুঝি না। বিবাহ করেছি এইটা বুঝি। তুমি বিদায় হও। আইজ রাইতের পরে আমার ঘরের আশেপাশে তোমারে যদি দেখি তোমার ঠ্যাং আমি ভেঙে দেব। শরিফার বর্তমান স্বামীর ঠ্যাং ভাঙা, আগের স্বামীরও ঠ্যাং ভাঙা। বিদায় হও।

ইমাম বাংলাঘর থেকে বের হলো, কিন্তু চলে গেল না। কদম গাছের নিচে বসে রইল। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। কিন্তু তার শীত লাগছে না। শরীর দিয়ে গরম ভাপ বের হচ্ছে। চাদরের নিচে করিমের হাতে ধারালো একটা ছুরি। আসরের নামাজের পর থেকেই সে ছুরি হাতে ঘুরছে।

শরিফা আতরের ঘরের রেলিং দেয়া খাটে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তার গায়ে জরি বসানো লাল শাড়ি। ধনু শেখ এই শাড়ি নেত্রকোনা থেকে লোক পাঠিয়ে



আনিয়েছেন। তার গলায় চন্দ্রহার। হাতে বালা। পায়ে রূপার মল। গয়না সবই বেদানার, ধনু শেখের নির্দেশে আতর পরিয়ে দিয়েছে।

খাটের মাঝখানে কলের গান। আতর বলল, নয়া মা, গান দিব ? গান শুনবেন ?

শরিফা মাথা নাড়ল। মাথা নাড়া থেকে হ্যাঁ না কিছু বোঝা গেল না। আতর ঘুরন্ত রেকর্ডে পিন রাখল। গান শুরু হয়েছে। জুলেখার কিন্নর কণ্ঠ। যদিও রেকর্ডে লেখা 'চাঁদ বিবির পল্লী গান'।

আমার গায়ে যত দুঃখ সয়  
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়।  
নিঠুর বন্ধুরে  
বলেছিলে আমার হবে  
মন দিয়াছি এই ভেবে  
সাক্ষী কেউ ছিল না সেই সময়  
সাক্ষী শুধু চন্দ্রতারা  
একদিন তুমি পড়বে ধরা  
ত্রিভুবনের বিচার যেদিন হয়

শরিফা ফিসফিস করে বলল, কী সুন্দর গান!

আতর বলল, এই মেয়ে আমাদের অঞ্চলের কেউ চিন্তা করবে ?

শরিফা বলল, কেউ চিন্তা করবে না। তার সঙ্গে দেখা হইলে সামনে বসায় দুইটা গান শুনতাম।

সত্যই দেখা করতে চান ?

শরিফা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আতর বলল, আমগাছে সুতা ঝুলায়া আসবেন, মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আমি একটা সুতা ঝুলাইছি।

কী জন্যে ঝুলাইছ ?

আতর সামান্য ইতস্তত করে সহজ গলায় বলল, সুতা ঝুলাইছি যেন একজনের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। আমগাছের সুতা ছাড়া এই বিবাহ হবে না। আমার বাপজান যদি শুনে, গাঙ্গে ডুবায় আমারে মাইরা ফেলবে।

শরিফা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

আতর বলল, আমি একটা হিন্দু ছেলেবেলা বিবাহ করতে চাই। তার নামের প্রথম অক্ষর শ। বলেন দেখি তালিব্য শ দিয়া কী নাম হয় ?

বলতে পারব না। আমি বাংলা লেখাপড়া জানি না। কোরান মজিদ পড়তে পারি। বাংলা পারি না।

শিখতে চান?

না।

না কী জন্যে?

মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে স্বামীর হায়াত কমে।

আমার বাপের হায়াত কমলে তো আপনার জন্যে ভালো। উনি মানুষ মন্দ। আপনারে কোনোদিন ছাড়বে না।

শরীফা তাকিয়ে আছে। আতর হালকা গলায় গল্প করছে। মেয়েটার গল্প শুনতে এত ভালো লাগছে। কেমন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কথা বলে।

আতর বলল, বাপজানরে বিবাহ কইরা আপনি কিন্তু বান্ধা পড়ছেন।

শরিফা বলল, আমারও সেইরকম ধারণা।

আতর বলল, এখন না ছাড়লেও কোনো একদিন ছাড়ব। যখন আপনার কোনোখানে যাওয়ার জায়গা থাকবে না তখন ছাড়ব। তখন আপনার না থাকবে ঘর, না থাকবে খাওন। আমার বড় মার এই দশা। আমার বড় মা যে জীবিত আছে জানেন?

না।

তার নাম আমিনা। আমার এক সৎভাই আছে, তার নাম বাহাদুর। বড়ই সুন্দর।

আতরের গল্প শেষ হলো না। ধনু শেখ স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

ধনু শেখের মেজাজ খুবই খারাপ। তিনি পাঞ্জাবিতে সামান্য আতর দিয়েছিলেন। আতরের গন্ধে এখন গা গুলাচ্ছে। বমি আসি আসি করছে। মনে হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় আজও হবে না। বমি করে পালংক ভাসাবেন। বমির মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বেন। অতিরিক্ত মদ্যপান করলে এই অবস্থা হয়। আজ বোতল হাতে পর্যন্ত নেন নি। জর্দা দিয়ে পান খেয়েছেন। আতর মেখেছেন।

শরিফা পালংক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লাল শাড়িতে তাকে সুন্দর লাগছে। ধনু শেখ বমি চাপতে চাপতে বললেন, শাড়ি পছন্দ হয়েছে?

শরিফা জবাব দিল না। ধনু শেখ বললেন, একটা জিনিস খেয়াল রাখবা। প্রশ্ন করলে উত্তর দিবা। উত্তর না দিলে চড় খাবা। শাড়ি পছন্দ হয়েছে?

হইছে।



এখন শাড়ি খুইল্যা ফেল। মেয়েছেলের সৌন্দর্য শাড়ি পরায় না। শাড়ি না পরায়। বুঝেছ?

শরিফা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। ধনু শেখ হামাগুড়ি দিয়ে শরিফার কাছে এগিয়ে এলেন। শরিফার গালে আচমকা চড় বসিয়ে বললেন, প্রশ্ন করেছি জবাব দেও নাই, এইজন্যে চড় খাইলা। বুঝেছ?

বুঝেছি।

স্ত্রীকে স্বামী বরাবর হইতে হয়। আগে তোমার স্বামী ছিল মাওলানা, তুমি ছিল মাওলানা। এখন তোমার স্বামী মদ খাউরা। তুমিও হবা মদ খাউরা। বুঝেছ?

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, বুঝেছি।

ধনু শেখ বলল, এক দুই চুমুক কইরা খাইলেই হবে। বোতল সাফা করতে হবে না। বোতল আমি সাফা করব। ঠিক আছে?

জি।

আইজ থাইকা শুরু হউক। তোমার ডাইন দিকের আলমিরাতে বোতল আছে। বোতল আন।

শরিফা বোতল আনতে রওনা হলো।

ধনু শেখ হুস্কার দিলেন।

অনেক আগে তোমারে ন্যাংটা হইতে বলছি। হও নাই। এখন হও। ন্যাংটা অবস্থায় বোতল আনবা। লজ্জা ভাঙা দরকার।

শরিফা থরথর করে কাঁপছে। গা থেকে শাড়ি খোলার চেষ্টা করছে। শাড়ি খুলছে না, আরো যেন পেঁচিয়ে যাচ্ছে।

ধনু শেখ বমি করছেন।

আতর চাঁন বিবির রেকর্ডটা আবার ছেড়েছে। সে ঝুঁকে আছে রেকর্ডের ওপর। গান শুনতে শুনতে এক চোখে পানি আসবে। এক ফোঁটা পানি রেকর্ডে পড়বে। গ্রামোফোনের পিন যখন অশ্রুভেজা জায়গাটা পার হবে তখন গান আরো মধুর লাগবে। ব্যাপারটা আতরের পূর্বপরীক্ষিত।

আতর এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে রেকর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। একই সময় ব্রিটিশ ফিল্ড মার্শাল তাঁর ক্যাম্পে একটি রেকর্ড বাজাচ্ছেন। রেকর্ডে Waltz মিউজিক হচ্ছে। তিনি এক বোতল রেড ওয়াইন খুলেছেন। কর্ক খুলতে গিয়ে কিছু রেড ওয়াইন ছিটকে পড়েছে রেকর্ডে। তিনি গ্লাসে ওয়াইন ঢালতে ঢালতে বললেন, The wine will make the music sweeter.

তারিখ ৫ই নভেম্বর ১৯৪২ সন। মন্টোগোমারীর আনন্দের দিন। কারণ তাঁর হাতে পরাজিত হয়েছেন ট্যাংক যুদ্ধের কিংবদন্তি জার্মান ফিল্ড মার্শাল রোমেল। যুদ্ধ হয়েছে মিশরের আল আমিনে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মন্টোগোমারী জয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

রেডওয়াইনের গ্লাস উঁচু করে ধরে মন্টোগোমারী বললেন, রোমেলের সাহসের তারিফ করে একটা টোস্ট যদি করি খুব অন্যায় কি হবে?

উপস্থিত চারজন ব্রিগেডিয়ারের ভেতর মাত্র একজন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। মন্টোগোমারী বললেন, ঠিক আছে, নাম না হয় উচ্চারণ নাই করলাম। বলি শুধু সাহসের প্রতি সম্মান।

এবার তিনজনই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। মন্টোগোমারী বললেন, To the courage.

গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকির ঝনঝন শব্দ হলো।

অন্যদিকে জার্মান সেনাবাহিনী ঢুকে পড়েছে স্টালিনগ্রাদে। সোভিয়েত সৈন্যরা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। তাদের দিয়ে যুদ্ধ করানো যাচ্ছে না। সোভিয়েত নেতা স্টালিন কাপুরুষতার জন্যে ১৩ হাজার সোভিয়েত সেনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এই খবরে জার্মান জেনারেল এরিখ ভন ম্যানস্টেইন যথেষ্টই আনন্দ পেলেন। তিনি রাশিয়ান ভদকা দিয়ে টোস্ট করলেন। বললেন, To the cowards.

সাহস এবং কাপুরুষতার জন্যে একই সময় পৃথিবীর দুই প্রান্তে টোস্ট করা হলো।





মাওলানা ইদরিস মহাবিপদে পড়েছেন। কোনোদিন বগুড়ার মহাস্থান নামের জায়গা খুঁজে বের করতে পারবেন এরকম মনে হচ্ছে না। পদে পদে বিপদে পড়ছেন। খাওয়াখাদ্য নিয়েও সমস্যা। চারদিকে অভাব। ভাতের দোকান বেশির ভাগই বন্ধ। তাঁর খুঁতিতে টাকা আছে। টাকা দিয়েও খাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। কালীঘাটা নামে এক লঞ্চঘাটে নামার সময় তার ব্যাগ চুরি হয়ে গেল। তাকে একবস্ত্রে নামতে হলো। ব্যাগে কঞ্চল ছিল। রাত কাটত কঞ্চল মুড়ি দিয়ে। প্রচণ্ড শীতে এখন গায়ের পাঞ্জাবি সম্বল। কালীঘাটা থেকে একটা গাড়ি চলাচল করে। একটাওয়ালা তাকে উল্টোপথে নিয়ে গেল। জনমানবহীন এক বিরানভূমিতে নামিয়ে দিয়ে বলল, নাক বরাবর হাঁটেন। জঙ্গল পাবেন। জঙ্গল পার হবেন, মহাস্থান পাবেন।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেঁটে তিনি জঙ্গল পার হলেন। মহাস্থান নামের এক কালীমন্দিরের দেখা পেলেন। মন্দিরের সেবায়ত ছোটখাটো মানুষ। মুখভর্তি জঙ্গুলে দাড়ি। দেখে মনে হয় মুসলমান। সে চাপা গলায় বলল, আপনি যাবেন বগুড়া। এটা রংপুর।

ইদরিস বললেন, এখন কী করব ?

আপনি মুসলমান ?

জি জনাব।

সঙ্গে টাকাপয়সা আছে ?

আছে।

কত টাকা ?

দুইশ টাকার সামান্য বেশি। পঁচিশ কিংবা ত্রিশ। গুনা নাই।

টাকা রেখেছেন কোথায় ?

আমার খুঁতিতে বান্ধা আছে।

দেখি।

ইদরিস কোমরে বাঁধা কাপড়ের থলি বের করে টাকা দেখালেন। লোকটা টাকা দেখতে চাচ্ছে কেন এটা বুঝলেন না।

সেবায়ত বলল, আপনি বোকা किसিমের মানুষ। আমি টাকা দেখতে চেয়েছি আপনি দেখালেন। কাজটা ঠিক হয় নাই। আপনি বলবেন, আমি ফকির মানুষ, টাকাপয়সা নাই।

টাকা তো আছে। মিথ্যা বলা ঠিক না। আপনি যখন বলেছেন তখন মিথ্যা বলব। বাঁচার জন্যে মিথ্যা বলায় দোষ নাই।

সেবায়ত বলল, খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

জি-না জনাব।

আমার বাড়িতে চলেন। খাওয়াদাওয়া করবেন। তারপরে দেখি কী করা যায়।

আপনার অনেক মেহেরবানি।

উঠানে বসে খাওয়াদাওয়া করবেন। মুসলমানকে বাড়িতে ঢুকাব না। এত বড় পাপ করতে পারব না।

ইদরিস বললেন, আপনার অনেক মেহেরবানি। আমাকে একটা চাদর কিনার ব্যবস্থা করে দেন। শীতে কষ্ট পাইতেছি।

চাদর পাবেন না। আশেপাশে দোকান নাই। থাকলেও সেখানে কাপড় নাই। বাড়িতে চলেন দেখি কাঁথা দেওয়া যায় কি-না। মেয়েছেলের ব্যবহারী কাঁথা গায়ে দিতে আপনাদের ধর্মে কি বাধা আছে?

জি-না জনাব, আপনার অনেক মেহেরবানি।

ভাত খাওয়াতে পারব না। দেশে ভাত নাই। মিষ্টি আলু সিদ্ধ খাবেন। নুন কাঁচামরিচ দিয়ে মিষ্টি আলু সিদ্ধ পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু।

জনাব, রিজিকের মালিক আল্লাহপাক। উনি যা নির্ধারণ করে দেন তাই খাওয়া লাগে। উনার কঠিন হিসাব, সেই হিসাবের বাইরে রাজা মহারাজাও যেতে পারেন না। আর আমি একজন নাদান মানুষ।

গ্রামের বাইরে ঝুপড়ি জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি। পাকাবাড়ি, তবে এখন ভগ্নদশা। বাড়িতে মনে হয় লোকজনও নাই। চারদিক সুনসান নীরব। বারান্দায় কুপি জ্বলছে। কুপির আলোয় অন্ধকার আরো বেড়েছে। অসুস্থ কোনো অতি বৃদ্ধা আছেন। তিনি ক্রমাগত কাশছেন। কাশির দমক একটু থামলেই বলছেন— যম কই রে। আয়। আমারে নিয়া যা। তোর চরণে ধরি।



ইদরিসের কয়েক বেলার নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা কাজা নামাজ শেষ করে খেতে বসলেন। বড় ঝকঝকে কাঁসার থালায় তাকে খেতে দেয়া হয়েছে। শুধু যে মিষ্টি আলু তা না, গুড় মাখানো ছাতু এবং একটা কলাও আছে। মাওলানা বসেছেন উঠানের এককোণে। তার সামনে কুপি জ্বলছে। মাওলানা খাওয়া শেষ করে হাত তুলে মোনাজাত শুরু করলেন—

হে আল্লাহপাক। চরম অভাবের দিনে যারা আমাকে এত যত্ন করে খাইয়েছে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর। তোমার রহমতের দরজা তুমি এদের জন্যে খুলে দাও। গাফুরুর রহিম তুমি দয়া কর। এদের প্রতি দয়া কর।

কপালে চওড়া করে সিঁদুর দেয়া ঘোমটা পরা একটা মেয়ে মাওলানার সামনে দাঁড়াল। তার হাতে ফুলতোলা কাঁথা। মেয়েটা নরম গলায় বলল, কাঁথাটা গায়ে দেন। শীত অনেক বেশি।

মাওলানা বললেন, মা শুকরিয়া।

বৌটি গলা নামিয়ে বলল, এখন আমার কথা মন দিয়া শুনেন। সে আঙুল উঁচিয়ে বলল, তালগাছ কি দেখা যায়?

মাওলানা মাথা নাড়লেন। অনেক দূরে কুয়াশার মতো তালগাছ দেখা যাচ্ছে।

দৌড় দিয়া তালগাছ পর্যন্ত যাবেন। সেখানে নদী পাবেন। নদীর নাম করতোয়া। নদী বরাবর দক্ষিণমুখী হাঁটবেন। সারারাত হাঁটবেন। থামবেন না। আমার স্বামী লোক খারাপ। আপনার সঙ্গে টাকাপয়সা আছে আপনি তাকে বলেছেন। সে লোক আনতে গেছে। টাকাপয়সা কেড়ে নিবে। আপনাকে মেরেও ফেলতে পারে। এই কাজ সে আগেও কয়েকবার করেছে। দাঁড়ায়া আছেন কেন? দৌড় দেন।

মা, আপনার নাম?

আমার নামে আপনার প্রয়োজন নাই। যা করতে বললাম করেন। হাতে সময় নাই।

নামটা বলেন মা। কোনো একদিন খাস দিলে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করব।

আমার জন্যে দোয়া করতে হবে না। আমার স্বামীর জন্যে প্রার্থনা করবেন যেন সে ভালো হয়ে যায়। আমার স্বামীর নাম লক্ষণ দেওয়ান।

বৃদ্ধা মহিলা ঘরের ভেতর থেকে কাশতে কাশতে ডাকছে, ও বৌমা! ও বৌমা!

বৌটি কুপি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। মাওলানা দৌড়াতে শুরু করলেন। অচেনা অজানা বৌটির কথা ভেবে চোখে পানি আসছে। এখন অশ্রুবর্ষণের সময়। মেয়েটার জন্যে আল্লাহপাকের দরবারে খাস দিলে প্রার্থনা করতে হবে। মেয়ের

স্বামীর জন্যেও করতে হবে। স্বামীর নাম লক্ষণ দেওয়ান। আজকাল তাঁর নাম মনে থাকে না। এই নাম কি মনে থাকবে? লক্ষণ দেওয়ান, লক্ষণ দেওয়ান, লক্ষণ দেওয়ান। বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেই নফল রোজা রেখে এই কাজটা করবেন।

রাত দশটার মতো বাজে। শীতের রাত বলেই নিশুতি মনে হচ্ছে। বান্ধবপুর বাজারের সব ঘরের বাতি নেভানো। লঞ্চঘাটায় কিছু আলো আছে। লাবুস পাকা পুলের উপর বসে আছে। পুলের মাথায় প্রকাণ্ড জামরুল গাছ। গাছভর্তি জোনাকি পোকা একসঙ্গে জ্বলছে নিভছে। দেখতে সুন্দর লাগছে। একটি জোনাকি অন্য একটির সঙ্গে কথা কীভাবে বলে? আলোর সংকেতে? জোনাকি পোকাদের কথা বুঝতে পারলে কত কী জানা যেত।

গায়ে কালো কস্মল জড়িয়ে কে যেন এদিকেই আসছে। লাবুসকে দেখে সে জামরুল গাছের আড়ালে চলে গেল। লাবুস বলল, কে?

আমি করিম। ইমাম করিম।

গাছের পিছনে লুকায়ে আছেন কেন?

তোমাকে দেখে শরমিন্দা হয়েছি বিধায় লুকায়ে আছি।

শরমিন্দা হয়েছেন কেন?

আমি সবার কাছেই শরমিন্দা। যার স্ত্রী অন্যের দখলে সে তো শরমিন্দা হবে। এটা জগতের নিয়ম। স্ত্রী অন্যের সঙ্গে ঘুমায়, এই কষ্ট তুমি বুঝবা না। তুমি শাদি কর নাই।

জোর করে কেউ আপনার স্ত্রী দখল করে নাই।

তাও ঠিক। আমার কপাল মন্দ।

আপনি সামনে আসেন। একটা বিষয় নিয়া আলাপ করি।

করিম এগিয়ে এলেন। লাবুসের পাশে বসলেন।

লাবুস বলল, আপনার স্ত্রীকে আমি যে মা ডাকি এটা কি আপনি জানেন?

করিম বিস্মিত হয়ে বলল, না। তবে তার সঙ্গে তোমার যে দেখা হয়েছিল এই বিষয়টা জানি।

লাবুস বলল, একজন পুরুষ যেমন তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে একজন স্ত্রী কি স্বামীকে তালাক দিতে পারে না? তাহলে আপনার স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিয়ে আপনার কাছে চলে আসতে পারেন।

স্ত্রীদের এই ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতা শুধু পুরুষের। স্ত্রী যদি তালাক চায় তাকে তার স্বামীকে টাকাপয়সা দিয়ে কিংবা হাতেপায়ে ধরে মানাতে হবে যেন স্বামী তালাক দেয়। এটা সহি হাদিস। বোখারি শরিফ।



এটা কি ভুল না ?

আসমানি কানুনের ভুল ধরা ঠিক না ।

লাবুস দীর্ঘশ্বাস ফেলল । করিম বললেন, আমি তোমার মা'কে একটা পত্র দিয়েছি । সেই পত্রে তাকে বলেছি পালায়া চলে আসতে । সে যদি পালায়া আসে তখন তারে নিয়া দূরদেশে চলে যাব । যেখানে কেউ তারে চিনে না । আমারেও চিনে না । আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করব ।

পত্র কি পাঠায়া দিয়েছেন ?

হঁ । ধনু শেখের মেয়ে আতরের হাতে দিয়েছি । সে বলেছে পত্র পৌছিয়ে দিবে । একটাই সমস্যা— তোমার মা বাংলা পড়তে জানে না ।

আতর পড়ে শুনাবে ।

করিম চুপ করে রইল । লাবুস বলল, শুনেছি ইমামের চাকরি আপনার চলে গেছে । নতুন ইমাম আসবে । আপনার এখন চলে কীভাবে ?

করিম জবাব দিল না ।

লাবুস বলল, আজ কি আপনার খাওয়া হয়েছে ?

করিম এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না । উঠে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে দ্রুত চলে গেল ।

করিম যাচ্ছে ধনু শেখের বাড়ির দিকে । খুব কাছে সে যাবে না । দূর থেকে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে । ধনু শেখের শোবার ঘরে আলো জ্বলছে । করিম একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । তার চোখ জ্বালা করছে ।

শরিফা মাথা নিচু করে খাটে বসে আছে । ধনু শেখ বসেছেন তার সামনে । দু'জনের হাতেই গ্লাস । ধনু শেখ যতবার বলছেন ততবারই শরিফা গ্লাস ঠোটে লাগাচ্ছে । শরিফা এমনভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে যেন তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ।

ধনু শেখ আদুরে ভঙ্গিতে ডাকলেন, শরিফা রানি ।

জি ।

এখন থেকে তোমারে ডাকব রানি । স্বামী আদর করে রানি ডাকে, এটা অনেক বড় ব্যাপার । বুঝেছ ?

বুঝেছি ।

চুমুক দাও । গ্লাস হাতে নিয়া বইসা থাকবা না । এইটা একটা ঢং । ঢং করবা না । ঢং আমার পছন্দ না ।

শরিফা গ্লাসে চুমুক দিল ।

ধনু শেখ বললেন, তোমার বিষয়ে আমার দিলখোশ হয়েছে। তোমারে নিয়া আমি কিছুদিনের জন্যে কলিকাতা যাব। ফুর্তির জায়গা দুনিয়াতে একটাই। কলিকাতা। বায়োস্কোপ দেখবা। বাইজি নাচ দেখবা। ঠিক আছে?

জি।

হাসিমুখে বলো ঠিক আছে। প্যাচার মতো মুখ কইরা কথা বলবা না। তুমি প্যাচা না। এক অক্ষরের কথা বলাও বন্ধ কর। তুমি টিকটিকি না যে সবকিছুতে বলবা— টিক টিক। এখন হাসিমুখে বলবা, আমি বাইজি নাচ দেখব।

শরিফা হাসিমুখে বলার চেষ্টা করল, আমি বাইজি নাচ দেখব। বলতে পারল না। মুখ আরো বিকৃত হয়ে গেল। ধনু শেখ এতেই সন্তুষ্ট হলেন। নেশাগ্রস্ত হয়ে তাঁর এমনই অবস্থা যে হাসি এবং কান্নার তফাৎ তিনি ধরতে পারলেন না।

ধনু শেখের মুখ দিয়ে লাল পড়ছিল। তিনি মুখের লাল মুহুর্তে মুহুর্তে বললেন, কলিকাতায় তোমার জন্যে ড্যান্স মাস্টার রেখে দিব। ড্যান্স মাস্টার তোমারে নাচ শিখাবে। ঘুংগুর পইরা তুমি নাচবা। ঝুমঝুম ঝুমঝুম ঝুমঝুম। চুমুক দেও।

শরিফা চুমুক দিল।

ড্যান্স মাস্টারের কাছ থাইকা নাচ শিখার পর তুমি আমার সামনে ন্যাংটা নাচ নাচবা। স্বামীর সামনে ন্যাংটা নাচে অসুবিধা নাই। স্বামী যদি সুখী হয় তার জন্যে আলাদা সোয়াব। বুঝেছ?

জি।

আতর শরিফাকে চিঠি দেয় নি। চিঠি প্রসঙ্গে কিছু বলেও নি। সে শুধু বলেছে, আমার কাছে আপনার একটা জিনিস আছে। যেদিন লেখাপড়া শিখবেন সেদিন দিব। তার আগে না।

শরিফা লেখাপড়া শিখছে। আরবি পড়া সে খুব সহজে শিখে ফেলেছিল। বাংলা বড়ই কঠিন লাগছে।

জায়গাটার নাম কালীবাড়ি। মাওলানা ইদরিস সন্ধ্যাবেলা কালীবাড়ি পৌঁছলেন। শূশানের মতো জায়গা। লোকজন কিছু নেই। লঞ্চঘাটে একটা বাতি জ্বলছে। সব কেমন ভুতুড়ে লাগছে। রাতটা কোথাও কাটানো দরকার। মাওলানার হাঁটার অবস্থা নেই। পা ফুলে গেছে। পায়ের পাতায় ফোসকা পড়েছে। পায়ের কষ্টের চেয়েও ক্ষুধার কষ্ট প্রবল হয়েছে। ক্ষুধায় তিনি অবসন্ন। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে, কিন্তু ক্ষুধার কারণে ঘুম আসবে বলেও মনে হয় না। ভাত খেতে ইচ্ছা করছে।



খালাভর্তি গরম ভাত হলেই হবে। আর কিছু লাগবে না। ভাতের ওপর লবণ ছিটিয়ে খেয়ে ফেলবেন। ভাত খাওয়ার পর এক জগ পানি।

মাওলানা খাবারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। তবে রাতে থাকার ব্যবস্থা হলো। মসজিদে থাকবেন। পাকা মসজিদ। মেঝেতে পাটি বিছানো। মসজিদে তিনি একা না। একজন সঙ্গীও আছে। সঙ্গীর নাম সরফরাজ। সুন্দর চেহারা। গোলগাল মুখ। কানঢাকা টুপি পরে আছেন। তিনি যাবেন কোলকাতা। কালীবাড়িতে লঞ্চ বদল করতে হয়। রাতে কোথাও থাকার জায়গা না পেয়ে মসজিদে উঠেছেন।

সরফরাজ সঙ্গী হিসেবে ভালো। মাওলানাকে দেখে বললেন, আপনার পায়ের যে অবস্থা তিন-চার দিন নড়তে পারবেন না। ফোসকার চিকিৎসা না করলে পায়ে ঘা হয়ে যাবে। রাতে কিছু খেয়েছেন?

মাওলানা বললেন, জি-না জনাব।

আমার কাছে আখের গুড় আছে, খাবেন? দুর্ভিক্ষের কারণে দেশের অবস্থা এমন যে টাকা থাকলেও খাওয়া পাওয়া মুশকিল। আখের গুড় খেয়ে পানি খান, ক্ষুধা কমবে।

সরফরাজ গুড় বের করে দিলেন। নিজেই মাটির সরায় করে পানি এনে দিলেন। মাওলানা তৃপ্তি করে পানি খেয়ে বললেন, জনাবের এশার নামাজ কি পড়া হয়েছে? পড়া না হয়ে থাকলে আসুন দুই ভাই মিলে নামাজটা পড়ে ফেলি।

সরফরাজ বললেন, আমি মুসলমান না। যখন মসজিদে থাকার দরকার পড়ে তখন মুসলমান নাম নেই।

আপনি কোন ধর্মের?

আমি কোনো ধর্মেরই না। মহাত্মা কবীরের অনুসারী বলতে পারেন।\* মহাত্মা কবীরের নাম শুনেছেন?

জি-না জনাব। আমি মূর্খ মানুষ।

মহাত্মা কবীর বলেছেন—

পাথর পূজে হরি মেলে তো

হাম পূজেঙ্গে পাহাড়।

অর্থ বুঝেছেন?

জি-না।

অর্থ হলো পাথর পূজা করে যদি ভগবান পাওয়া যেত তাহলে ছোট পাথর পূজা না করে আমি পাহাড় পূজা করতাম। গুয়ে পড়ুন। আপনাকে খুবই কাহিল

\* ধর্মগুরু। গুরু নানকের সমসাময়িক।

দেখাচ্ছে। নামাজ টামাজ যা পড়ার কাল পড়বেন। কাজা পড়ে ফেলবেন। তাছাড়া ভ্রমণের সময় নামাজের ব্যাপারে আপনাদের কিছু রেয়াত আছে না?

জি আছে।

তাহলে আর কথা কী। টেনে ঘুম দিন।

মাওলানা ইদরিস ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর গাঢ় ঘুম হলো। ফজরের ওয়াক্তে মুসল্লিরা এসে তাঁর ঘুম ভাঙাল। তিনি বিশ্বয়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন, কোমরের সঙ্গে বাঁধা খুঁনিটা নেই।

নিশিসঙ্গী কবীরভক্তও নেই। শরীর কাঁপিয়ে তার জ্বর এলো। ইদরিস মসজিদের বারান্দায় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রইলেন। ভাগ্যকে দুষতে ইচ্ছা করছে। দুষতে পারছেন না। আল্লাহপাক বলেছেন, ‘তুমি ভাগ্যকে দোষ দিও না। কারণ আমিই ভাগ্য।’

কালীবাড়ির মসজিদে তিনদিন তিন রাত প্রায় অচেতন অবস্থায় কাটালেন। চতুর্থদিনে মুসল্লিরা তাঁকে কোলকাতার এক লঞ্চে তুলে দিলেন। মসজিদে মরে পড়ে থাকার চেয়ে লঞ্চে মরে থাকুক।

মাওলানা লঞ্চার খোলা ডেকে শুয়ে আছেন। তাঁর মুখের ওপর মাছি ভনভন করছে। ডেকের এক কোনায় বাদ্য বাজনার দল বসেছে। শীত কাটানোর জন্যে তারা গান করছে। গান জমছে না। বারবার তাল কাটছে। মূল গায়ক বড়ই বিরক্ত হচ্ছে।

কালী, হলি মা রাসবিহারী

নটবর বেশে বৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনে এ এ এ এ...

লঞ্চ বড় নদীতে পড়ে খুব দুলছে। মাওলানার মনে হচ্ছে তিনি গড়িয়ে পানিতে পড়ে যাচ্ছেন। গানের দলের মূল গায়নকে বললেন, বাবা, আমাকে একটু ধরেন। গায়ন তাঁর কথা শুনতে পেল না। সে কানে হাত দিয়ে লম্বা করে সুর টানল— বৃন্দাবনে এ এ এ।

রাত অনেক।

ধনু শেখ দলবল নিয়ে লাবুসের বাড়িতে এসেছেন। পাক্ষিতে করে এসেছেন। পাক্ষির ভেতরই বসে আছেন। তাঁর হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। তার সঙ্গীদের মধ্যে একজনের হাতে হ্যাজাক বাতি। হ্যাজাকের ঝকঝকে সাদা আলোয় লাবুসের বাড়ির উঠান আলোকিত। লাবুস এগিয়ে এলো। এত রাতে ধনু শেখের আসার কারণ সে বুঝতে পারছে না। নিশ্চয়ই বড় কোনো ঘটনা ঘটেছে।



কেমন আছ লাবুস ?

ভালো আছি ।

সবকিছু কি ঠিকঠাক ?

জি ঠিকঠাক ।

কোনোখানে বেতাল কিছু আছে ?

লাবুস বিম্বিত হয়ে বলল, না ! লাবুসের পাশে শ্রীনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন । তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । হৈচৈ শুনে জেগেছেন । আচমকা ঘুম ভাঙায় ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছেন না ।

ধনু শেখ বললেন, আমার স্ত্রী শরিফা কি তোমার বাড়িতে লুকায়ে আছে ?

জি-না ।

হুট কইরা না বলবা না । চিন্তা ভাবনা কইরা বলো । তোমার এই বিশাল বাড়ির কোনো চিপায় চাপায় লুকায়া থাকতে পারে । ভালোমতো সন্ধান না কইরাই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না । তুমি নিজে সন্ধান কর । আমার লোকজনও সন্ধান করবে ।

জি আচ্ছা ।

শরিফার সাথে আমার সামান্য মনকষাকষি হয়েছে । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এইসব হয় । সে রাগ করে বের হয়ে গেছে । বুঝেছ ?

জি । আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন ?

আমারে ভিতরে নেওয়া আরো ঝামেলা । কোলে কইরা নিতে হবে । তার প্রয়োজন নাই । যেখানে আছি ভালো আছি । তোমার এখানে কি তামাকের ব্যবস্থা আছে ? ব্যবস্থা থাকলে তামাক দিতে বলো ।

হাদিস উদ্দিন তামাক সাজিয়ে নিয়ে এসেছে । ধনু শেখ গুড়ুক গুড়ুক করে নল টানছেন । তামাকের ধোঁয়া চিন্তা পরিস্কারক । ধনু শেখ হাদিস উদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর নাম কী ?

হাদিস উদ্দিন ।

লোকমুখে শুনি শশাংক পাল মরে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন । এই বাড়ির আশেপাশে তারে দেখা যায় । কথা কি সত্য ?

জি সত্য । ষোল আনা সত্য ।

তুই কোনোদিন দেখেছিস ?

জে না ।

তাহলে কীভাবে বললি ষোল আনা সত্য ?

শ্রীনাথ বাবু দেখেছেন ।

শ্রীনাথটা কে ?

গোমস্তার কাজ করে ।

সে কই ?

এতক্ষণ আপনার সামনেই ছিল, এখন ছোটকর্তার সঙ্গে অন্দরে গেছেন ।

তারে ডাক দিয়া আন । ভূতের কী ঘটনা শুনি ।

হাদিস উদ্দিন এক দৌড়ে অন্দরে ঢুকল । গভীর রাতে হঠাৎ এই কর্মব্যস্ততায় সে আনন্দ পাচ্ছে । ধনু শেখ আরাম করে হুঁকা টানছেন, এটাও তার জন্যে আনন্দের । ভালো জিনিসের মর্ম সবাই বুঝে না ।

তোমার নাম শ্রীনাথ ?

জি ।

চেহারা-ছবি তো ভালো না । শ্রীনাথ নাম না হয়ে বিশ্রীনাথ নাম হলে মানানসই হতো । হা হা হা ।

নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে ধনু শেখ অনেকক্ষণ হাসলেন । শ্রীনাথ শুকনা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল ।

শশাংক পালের ভূত তুমি নাকি দেখেছ ?

আজ্ঞে দেখেছি ।

কী দেখেছ গুছায়া বলো । তার আগে বলো কতবার দেখেছ ?

অনেকবার দেখেছি ।

সর্বশেষ কবে দেখেছ ? কী দেখেছ ?

শ্রীনাথ গলা খাঁকারি দিয়ে গল্প শুরু করল । এ ধরনের গল্প বলতে সে খুবই পছন্দ করে । তবে আজ গল্প বলে আরাম পাওয়া যাচ্ছে না । যারা ভূত বিশ্বাস করে না তাদের সঙ্গে ভূতের গল্প করে আরাম নেই । এরা হঠাৎ বেমাক্কা প্রশ্ন করে গল্প উলট-পালট করে ফেলে ।

সন্ধ্যাবেলা আমি বাগানে গিয়েছি নিমের ডাল আনব । দাঁত মাজব । ডাল ভেঙেছি । কী কারণে যেন গাছের উপর চোখ গিয়েছে, দেখি সেখানে কে যেন বসে আছে ।

গাছে কি শশাংক পাল বসা ?

জি । আমার দিকে তাকায়া আছেন, মুখে হাসি ।

তুমি কী করলা ? ঝাঁকি দিয়া তারে গাছ থাইকা ফেললা ?

শ্রীনাথ গল্প বন্ধ করে দিল । এই মানুষকে ভূতের গল্প শোনানোর কোনো অর্থ হয় না । যে-কেউ গাছে ভূত দেখলে দৌড়ে পালাবে । গাছে ঝাঁকি দিয়ে ভূত মাটিতে ফেলবে না । ভূত তো ফল না যে ঝাঁকি দিয়ে গাছ থেকে ফেলতে হবে ।



চুপ করলা কেন ? তারপর কী হলো বলো । শশাংক পালের ভূত কী করল ? গাছের উপর থেকে তোমার শরীরে পেসাব করে দেয় নাই তো ? শুনেছি অনেক দুষ্টভূত এই কাজ করে । পেসাব কি করেছে ?

শ্রীনাথ কী বলবে ভেবে পেল না ।

শরিফাকে পাওয়া গেল না । ধনু শেখ পাক্কি উঠাতে বললেন । এখন যাবেন রঙিলা বাড়িতে । নটিবাড়িগুলো সুন্দরী মেয়েদের পালায়া থাকার জন্যে ভালো জায়গা । বাড়ির মালেকাইন এদের আগ্রহ করে স্থান দেয় । গানবাজনা শিখিয়ে একসময় কাজে লাগিয়ে দেয় । নটিবাড়িগুলোতে মেয়ের অভাব কখনোই হয় না ।

রঙিলা বাড়িতে যাবার পথে ধনু শেখের সঙ্গে করিমের দেখা হয়ে গেল । করিম লঞ্চঘাটে হাঁটাহাঁটি করছে । ধনু শেখ পাক্কি থামিয়ে বললেন, কে ? ইমাম করিম না ?

করিম উঠে দাঁড়াল । যন্ত্রের মতো বলল, আসসালামু আলায়কুম ।

ধনু শেখ বললেন, ওয়ালাইকুম । শরিফা যে পালায়ে গেছে এই খবর শুনছ ? জি ।

নটিবাড়িতে যাইতেছি তার সন্ধানে । যদি দেখি সে নটিবাড়িতে দাখিল হয়েছে তাহলে আর ফিরায়া আনব না । এটা দস্তুর না । আমোদ ফুর্তি করতে চাইলে তখন নটিবাড়িতে যাব । ইচ্ছা করলে তুমিও যাইতে পারবা । নটিবাড়ির মেয়েগুলার সুবিধা আছে । তারা একজনের বউ না । সকলের বউ । ভালো বলেছি না ?

করিম তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে । ধনু শেখ করিমের তীব্র চাউনি উপেক্ষা করে বললেন, শরিফা জঙ্গলেও লুকায়ে থাকতে পারে । জঙ্গলে লোক পাঠায়েছি । ইচ্ছা করলে তুমিও যেতে পার । ঘোষণা দিয়েছি, যে শরিফারে খুঁজে পাবে তার জন্যে তিনশ' টাকা পুরস্কার ।

করিমের বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে । সে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলাল । তার চোখের সামনে দিয়ে ধনু শেখের পালকি নটিবাড়ির দিকে যাচ্ছে । পাক্কি মাত্র দু'জন টানছে । বিশাল বপু ধনু শেখকে টানতে তাদের কষ্ট হচ্ছে । এই প্রবল শীতেও তাদের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে ।

শরিফা লুকিয়ে আছে ধনু শেখের বাড়িতে । সে আছে আতরের ঘরে রাখা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুকের ভেতরে । সিন্দুক তালাবদ্ধ । চাবি আতরের ঘরের আলমারির ওপর । সিন্দুকের ওপর বিছানা করা । সেই বিছানায় ঘুমায় হামিদা । শরিফাকে

লুকিয়ে রাখায় হামিদার ভালো ভূমিকা আছে। হামিদা নৌকা ঠিক করে রেখেছে। সময় সুযোগ মতো নৌকা শরিফাকে ভাঁটির দিকে নিয়ে যাবে। ভাঁটি অঞ্চলে শরিফার দেশ। কেউ-না-কেউ তাকে আশ্রয় দিবে।

শরিফাকে লুকিয়ে রাখার অসীম সাহসী কাজটি আতর করেছে, কারণ শরিফা তার এই মেয়ের কাছে ধনু শেখের কর্মকাণ্ড সবই কাঁদতে কাঁদতে বলেছে। তাকে কোলকাতায় নিয়ে নাচ শেখানো হবে, তাকে স্বামীর সামনে নগ্ন নৃত্য করতে হবে এই তথ্যও গোপন করে নি।

আতর বলেছে, নয়া মা! বাপজানের কলিকাতা যাওয়ার আগেই আমি ব্যবস্থা নিব। আপনি চিন্তা নিয়ে না।

ধনু শেখের আগামীকাল ভোরেই কোলকাতা যাবার কথা। নিজের লঞ্চে করে যাবেন। কেবিনের ঘর ঝাড়পোছ করা হয়েছে। বিছানা বালিশ তোলা হয়েছে। তখনই আতর ব্যবস্থা নিয়েছে। ধনু শেখকে গিয়ে বলেছে, বাপজান, নয়া মা তো ঘরে নাই। লাবুস চাচার বাড়ির দিকে দৌড়ায়া যাইতে দেখেছি।

ধনু শেখ রঙিলা বাড়িতে। তাঁকে যত্ন করে রুপার বাটায় পান দেয়া হয়েছে। গোলাপ জলের হুকায় তামাক দেয়া হয়েছে। ধনু শেখ নিশ্চিত হয়েছেন রঙিলা বাড়িতে শরিফা নেই। তিনি ফিরে আসতে চাচ্ছেন। মালেকাইন তাকে ছাড়ছেন না। হাতজোড় করে বলেছেন, হুজুর এতদিন পর দয়া করেছেন। আজ রাতে আপনাকে ছাড়ব না। আপনার সম্মানে সারারাত গানবাজনা হবে। ভালো বিদেশী পানি আছে। এক চুমুক হলেও মুখে দিতে হবে। ধনু শেখ দোটানায় পড়ে গেছেন। মালেকাইন বলল, তের বছরের একটা মেয়ে নতুন এসেছে। ডানাকাটা পরী কেউ দেখে নাই, এই মেয়ে ডানাকাটা পরী।

মেয়ের নাম কী?

মেয়ের নতুন নাম এখনো দেওয়া হয় নাই। আপনি একটা নাম দেন।

আমি নাম দিলাম আঙুর।

ভালো নাম দিয়েছেন। তবে এই মেয়ে আঙুরের অধিক মিষ্ট। তারে কি আনব?

আনো।

শরিফাকে খুঁজতে আজ অনেক পরিশ্রম হয়েছে। এখন বিশ্রাম দরকার।

হামিদা শরিফাকে বোরকা পরিয়ে নৌকায় তুলে দিয়েছে। ছইওয়ালা বড় নৌকা। চারজন মাঝি। এরা সারারাত নৌকা বেয়ে শরিফাকে সেতাবনগরে পৌঁছে দিবে। সেতাবনগরে শরিফার এক ফুফু আছেন। শরিফাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। আপাতত শরিফা সে বাড়িতেই থাকবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।



নৌকার ছইয়ের দু'পাশ শাড়ি দিয়ে পর্দা দেয়া। ভেতরটা অন্ধকার। অন্ধকারে গুটিসুটি মেয়ে শরিফা বসে আছে। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না সে মুক্তি পেয়েছে।

গভীর রাতে নৌকা হাওরের মুখে পড়ল। হাওর এখন শুকিয়ে গেছে। হাওরের মাঝখান দিয়ে মূল নদীতে সামান্য পানি। নৌকা থেমেছে। মাঝিরা বিড়ি খাচ্ছে। বিড়ির উৎকট গন্ধে শরিফার বমি আসছে। সবাই নৌকা থামিয়ে একসঙ্গে বিড়ি খাচ্ছে কেন শরিফা বুঝতে পারছে না। পর্দার ফাঁক দিয়ে শরিফা দেখল মাঝিদের একজন কুপি জ্বালাচ্ছে। শরিফা বলল, নৌকা থামা কেন?

কুপি যে জ্বালাচ্ছে সে বলল, এত দূরের পথ যাব, আমরা চারজনে পাইছি মাত্র দশ টেকা। এইজন্য ঠিক করেছি আপনারে নিয়া আমরা রঙতামাশা করব। চিংকার দিয়া লাভ নাই। কোনোদিকে জনমানুষি নাই। আপোসে রঙতামাশা করলে আপনার ভালো আমারও ভালো।

মাঝির কথা শেষ হবার আগেই পেছন দিকের পর্দা সরিয়ে একজন ঢুকে শরিফার মুখ চেপে ধরল। ভারী গলায় বলল, একজন আস, ঠ্যাং চাইপা ধর। ঠ্যাং দিয়া লাখি দিতে পারে। আরেকজন থিক থিক করে হাসতে হাসতে বলল, আমি 'বুনি' চাইপা ধরব। ঠ্যাং ধরব কোন কামে। হি হি হি।

সারারাত রঙতামাশা করে তারা অচেতন শরিফাকে ফেলে গেল পরিত্যক্ত এক বিষ্ণুমন্দিরে। সেখান থেকে তার স্থান হলো রঙিলা নটিবাড়িতে।

মাওলানা ইদরিস শুয়ে আছেন শিয়ালদা রেলস্টেশনের প্লাটফরমে। তিনি একা না। তাঁর মতো আরো অনেকেই আছেন। এদেরকে আলাদা করা হয়েছে, কারণ এরা মারা যাচ্ছে।

হাসপাতালে রোগীর জায়গা নেই। স্বৈচ্ছাসেবীরা কিছু সাহায্যের চেষ্টা করছে। সেই সাহায্য কোনো কাজে আসছে না। মাওলানাকে সকালবেলা একটা রুটি দেয়া হয়েছে। মাওলানা রুটি খান নি। রুটি তার পাশে পড়ে আছে, সেখানে পিঁপড়া উঠেছে। মাওলানা আছেন প্রবল ঘোরে। সারাক্ষণই তাঁর মনে হচ্ছে মাথার ভেতর দিয়ে ট্রেন চলাচল করছে।

কংগ্রেসকর্মীরা সাহায্য নেমেছে। ব্যাগে ওষুধপত্র নিয়ে এসেছে। তারা রোগীদের তালিকা তৈরির চেষ্টাও করছে। একজন খাতাকলম নিয়ে মাওলানার পাশে বসল।

আপনার নাম?

ইদরিস। মাওলানা ইদরিস।

গ্রাম ? গ্রামের নাম বলুন ।

বান্ধবপুর ।

কী বললেন ? বান্ধবপুর ? জেলা কি ময়মনসিংহ ?

জি ।

আপনি কি কোরানে হাফেজ ?

জি ।

যমুনা নামের কাউকে চেনেন ?

জি-না জনাব ।

যমুনার বিয়ে হয়েছিল সুরেন নামে একজনের সঙ্গে । ডাক্তার সুরেন । যমুনা বান্ধবপুরের মেয়ে । চিনেছেন ?

না । জনাব আমি আর কথা বলতে পারতেছি না । আমারে ক্ষমা দেন ।

মাওলানা ইদরিস প্রবল ঘোরে তলিয়ে গেলেন । ঘোর ভাঙলো অনেক পরে । তিনি অবাক হয়ে দেখলেন একটা মেয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে আছে । মেয়েটা ব্যাকুল গলায় বলল, কাকু, আমাকে চিনেছেন ?

চিনেছি ।

বলুন তো আমি কে ?

তুমি ললিতা । বগুড়ার ।

ভালো করে আমাকে দেখে তারপর বলুন । আমি ললিতা না ।

তুমি জমিদার শশাংক পালের মেয়ে ললিতা । মা কেমন আছ ? তোমার পিতা শশাংক পালের ইন্তেকাল হয়েছে ।

যমুনা বলল, কাকু, আমি আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি । যখন আমার কোনো আশ্রয় ছিল না তখন আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন ।

ইদরিস ক্ষীণ স্বরে বললেন, কাঁদছ কেন ললিতা ?

কাকু, আপনাকে এই অবস্থায় দেখে কাঁদছি ।

মাওলানা চোখ বন্ধ করলেন । তাঁর মাথার ভেতর দিয়ে আবার ট্রেন চলাচল শুরু করেছে । একটা না, অনেকগুলো ট্রেন একসঙ্গে চলছে । ট্রেনগুলো আবার লঞ্চ ইন্সটিমারের মতো ভোঁ ভোঁ শব্দে ভেঁপু বাজাচ্ছে ।

যমুনার বাড়ি বাগবাজারে । দু'কামরার একতলা বাড়ি । ছোট্ট বারান্দা । বারান্দায় যমুনা আগ্রহ করে অনেক ফুলের টব রেখেছে । প্রতিটি ফুলের টবে মাধুরীলতা । এই ফুল যমুনার খুব পছন্দ । সুরেন মাধুরীলতা বলে না । সুরেন বলে যমুনা লতা ।



বাড়ির দু'টি কামরার একটি যমুনা আলাদা করে রেখেছে। সেখানে তরুণ এক কংগ্রেস কর্মী থাকেন। মানুষের সেবা করার জন্যে এই মানুষটা সবসময় ব্যস্ত হয়ে থাকেন। যমুনা তাকে বড়দা ডাকে। যমুনার বড়দা লেখালেখি করেন। তিনি লেখেন মেঝেতে বসে। তাঁর সামনে থাকে মাড়োয়ারীদের ক্যাশবাক্সের মতো ছোট টেবিল। যমুনা তরুণ এই লেখকের লেখার জন্যে পশমের একটি আসন নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছে।

এই ঘরের খাটে মাওলানা ইদরিসকে শোয়ানো হয়েছে। যমুনার বড়দা বললেন, আমার ঘর বেদখল হয়ে গেল।

যমুনা বলল, বড়দা! পৃথিবীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে উনি একজন।

পৃথিবীটাকে এত ছোট করে দেখা কি ঠিক?

যমুনা বলল, পৃথিবী যত বড়ই হোক, উনি পৃথিবীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে একজন। উনার অবস্থা ভালো না। সুরেন বলেছে শ্বাসতন্ত্রে জটিল সংক্রমণ হয়েছে। বড়দা, আমি উনাকে এদেশের সবচে' বড় ডাক্তার দেখাতে চাই। তুমি বিধানচন্দ্র রায়কে নিয়ে আসবে।

সর্বনাশ উনাকে কীভাবে আনবে?

যমুনা বলল, কীভাবে আনবে আমি জানি না। তোমাকে আনতে হবে।

বাংলার কিংবদন্তি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় রোগী দেখতে এসেছেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, রোগীর ঘরে পা দেয়া মাত্র তিনি রোগ ধরতে পারেন। রোগীর গা থেকে আসা গন্ধ তাঁকে রোগ বলে দেয়।

বিধানচন্দ্র বললেন, রোগীর অবস্থা ভালো না। নিশ্চয় রোগীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। রোগীর দু'টা বুকেই নিউমোনিয়া, একইসঙ্গে প্রবল ম্যালেরিয়ার সংক্রমণও হয়েছে। নিউমোনিয়ার চিকিৎসা আগে হওয়া দরকার। কিন্তু আমি ম্যালেরিয়াকে আগে ধরব। রোগীকে গরম পানিতে গুইয়ে রাখতে হবে।

যমুনা বলল, উনি বাঁচবেন?

বিধানচন্দ্র বললেন, মা, তুমি বিধানচন্দ্রকে এনেছ? রোগী না বাঁচলে বিধানচন্দ্রের মান কি থাকে?

মাওলানা ইদরিস তাকিয়ে আছেন। তাঁর গায়ে কম্বল। খোলা জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে কম্বলের ওপর। মাওলানা কিছুক্ষণ রোদ দেখলেন, তারপর দৃষ্টি ফেরালেন ঘরের মেঝের দিকে। সেখানে কৃশকায় কৃষ্ণবর্ণের এক যুবক মাটিতে

আসন করে এই শীতে খালি গায়ে বসেছে। তার গায়ের পৈতা ঝকঝক করছে।  
যুবক একমনে লিখে যাচ্ছে। একসময় এই যুবক লেখা থেকে চোখ তুললেন।  
তখনি মাওলানা ইদরিসের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো।

যুবক বললেন, আজ কি একটু ভালো বোধ করছেন?

মাওলানা বললেন, জি জনাব। আপনার নাম?

আমার নাম তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কী লিখছেন?

একটা উপন্যাস লিখছি। উপন্যাসের নাম ‘গণদেবতা’। ভারতবর্ষ নামে  
একটা পত্রিকা আছে সেখানে ধারাবাহিকভাবে বের হয়।

মাওলানা বললেন, আমি গল্প-উপন্যাস কোনোদিন পাড়ি নাই। হাদিস  
কোরান পড়েছি। কী লিখেছেন একটু পড়ে শুনাবেন?

তারাশংকর বললেন, অবশ্যই।

সোঁ সোঁ শব্দে প্রবল ঝড়। ঝড়ে চালের খড় উড়িতেছে, গাছের  
ডাল ভাঙিতেছে। বিকট শব্দে ওই কার টিনের ঘরের চাল  
উড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই নামিল ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি।  
দেখিতে দেখিতে চারদিক আচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বর্ষণ।  
আঃ পৃথিবী যেন বাঁচিল। ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়ায় ভিজা মাটির  
সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠিতে লাগিল।

নোবেল সাহিত্য পুরস্কার কমিটির দুর্ভাগ্য, তারা বাংলার এই ঔপন্যাসিকের খোঁজ  
বের করতে পারেন নি। তাদের পুরস্কারের খাতায় এই মহান কারিগরের নাম উঠে  
নি।

হে মহান বিশ্ব ঔপন্যাসিক! আপনি ‘মধ্যাহ্নে’র এক সামান্য লেখকের ভক্তি,  
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা গ্রহণ করুন।

‘গণদেবতা’ উপন্যাসের জন্যে তারাশংকর ১৯৬৬ সনে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান।

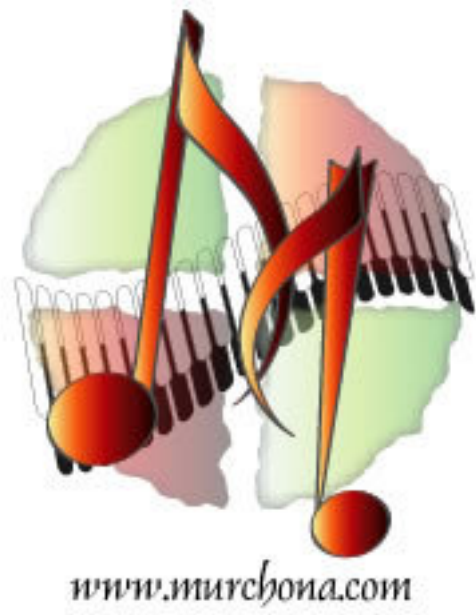




বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত পঁয়ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, নয় নম্বর বিপদ সংকেত... ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। তাঁর বেশ কটি উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। একটি উপন্যাস 'গৌরীপুর জংশন' সাতটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে এই উপন্যাসের ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি ও ফার্সি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।



## **Maddhanya.2 by Humayun Ahmed** **[Part.1]**



**For More Books & Music Visit [www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)**  
**MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>**  
**[suman\\_ahm@yahoo.com](mailto:suman_ahm@yahoo.com)**